TRAINING MANUAL

সুন্দরবনের ছোট ও মাঝারি পুকুরে দেশীয় পোনা ও ছোট মাছ চাষের প্রশিক্ষণ সহায়িকা

Anit Mondal, W.W.M. Apsara P.K. Wanasinghe, Aparna Roy, Abinaya Sathiskumar, Gunjan Karnatak, Nirupada Thangjam, Srikanta Samanta, Suman Kumar Maity, Amitava Roy, Avinandan Taron

July 2026

সুন্দরবনের ছোট ও মাঝারি পুকুরে দেশীয় পোনা ও ছোট মাছ চাষের প্রশিক্ষণ সহায়িকা

Authors

Anit Mondal, Research Consultant, International Water Management Institute (IWMI), Colombo, Sri Lanka
W.W.M. Apsara P.K. Wanasinghe, Research Intern, IWMI, Colombo, Sri Lanka
Aparna Roy, Senior Scientist, ICAR-Central Inland Fisheries Research Institute, Kolkata, India
Abinaya Sathiskumar, Research Consultant, IWMI, Colombo, Sri Lanka
Gunjan Karnatak, Senior Scientist, ICAR-Central Inland Fisheries Research Institute, Kolkata, India
Nirupada Thangjam, Scientist, ICAR-Central Inland Fisheries Research Institute, Kolkata, India
Srikanta Samanta, Head of Division and Principal Scientist, ICAR-CIFRI, Kolkata, India
Suman Kumar Maity, Consultant, IWMI, Colombo, Sri Lanka
Amitava Roy, General Secretary, Lokamata Rani Rahmoni Mission, India
Avinandan Taron, Researcher, IWMI, Colombo, Sri Lanka

Authors contributions

Methodology: Srikanta Samanta, Aparna Roy, W.W.M. Apsara P.K. Wanasinghe, Abinaya Sathishkumar; Validation: Gunjan Karnatak, Nirupada Thangjam, Srikanta Samanta, Amitava Roy, Avinandan Taron; Formal analysis: Gunjan Karnatak, Nirupada Thangjam, Aparna Roy, Srikanta Samanta; Investigation: Anit Mondal, Suman Kumar Maity, Abinaya Sathiskumar, W.W.M. Apsara P.K. Wanasinghe; Writing (original draft) – Anit Mondal, W.W.M. Apsara P.K. Wanasinghe, Aparna Roy, Abinaya Sathiskumar, Suman Kumar Maity; Writing (Reviewing and Editing) – Aparna Roy, Srikanta Samanta, Avinandan Taron; Visualization: Anit Mondal, Suman Kumar Maity, Abinaya Sathiskumar, W.W.M. Apsara P.K. Wanasinghe; Supervision: Aparna Roy, Srikanta Samanta, Avinandan Taron, Amitava Roy; Project administration: Avinandan Taron, Amitava Roy; Funding acquisition: Avinandan Taron, Amitava Roy.

Acknowledgements

This work was conducted under the CGIAR Initiative on One Health and finalized with support from the CGIAR Sustainable Animal and Aquatic Foods Program. We would like to thank all funders who supported this research through their contributions to the CGIAR Trust Fund (https://www.cgiar.org/funders/)

CGIAR Sustainable Animal and Aquatic Foods Program

The science program envisions improving the lives and well-being of people in low- and middle-income countries by sustainably transforming animal and aquatic food systems, so they foster inclusive, healthy, and nutrient-dense food supply chains that are climate- and environmentally- friendly in Kenya, Ethiopia, Mali, Tanzania, Uganda, Vietnam, Bangladesh, India, Nepal, Colombia, Guatemala, Senegal, Tunisia, Cambodia, Ghana, Nigeria, Timor Leste, Zambia, Malaysia and Egypt. (https://www.cgiar.org/cgiar-research-portfolio-2025-2030/sustainable-animal-and-aquatic-foods)

Citation

Mondal, Anit, W. W. M. Apsara P. K. Wanasinghe, Aparna Roy, et al. 2026. *Nutritional and Profitable Aquaculture in Small Ponds of the Sundarbans: A Farmer Training Manual* [in Bengali]. International Water Management Institute (IWMI).

© 2026 International Water Management Institute. Some rights reserved. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

Cover Photo: Surajit Ghosh/IWMI

Disclaimer

This publication has been prepared as an output of the CGIAR Sustainable Animal and Aquatic Foods Program and has not been independently peer reviewed. Responsibility for editing, proofreading, and layout, opinions expressed, and any possible errors lies with the authors and not the institutions involved. The boundaries and names shown and the designations used on maps do not imply official endorsement or acceptance by IWMI, CGIAR, our partner institutions, or donors.

সূচিপত্র

ক্রমিক নং:	বিষয়
১	ভূমিকা
২	সম্মিলিত মাছচাষের যৌক্তিকতা
৩	পুষ্টি ও সুস্বাস্থ্যের প্রাকৃতিক উৎস হিসেবে ছোট দেশীয় মাছ
৪	কয়েকটি ছোট দেশীয় মাছের বৈশিষ্ট্য ও পরিচিতি
৫	পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে স্বল্প বিনিয়োগে বিকল্প জীবিকা হিসেবে: SIS - কার্প পলিকালচার
৬	পুকুরের প্রকারভেদ
৭	মাছচাষের পদ্ধতি
৬	• মাছ মজুদ পূর্ববর্তী ব্যবস্থাপনা ▪ পুকুরের জলের নিষ্কাশন ▪ রোদে শুকানোর প্রথমধাপ ▪ কাদা অপসারণ এবং পুকুরের পাড় ও তলদেশ মেরামত ▪ রোদে শুকানোর দ্বিতীয়ধাপ ▪ পুকুরে জল ভরাট ▪ জলজ আগাছা নিয়ন্ত্রণ ▪ শিকারী মাছ নিয়ন্ত্রণ ▪ চুন প্রয়োগ ▪ সার প্রয়োগ ▪ সুষম সার ব্যবস্থাপনা ▪ পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য (প্ল্যাঙ্কটন) পরীক্ষা ▪ পুকুরের বিষাক্ততা পরীক্ষা
৭	জৈব নিরাপত্তা
৮	পুকুরের বাঁধের স্থায়িত্ব ও বন্যা থেকে সুরক্ষা
৯	• পুকুরে মাছ মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা ▪ প্রজাতি নির্বাচন ▪ মাছের চারা মজুদের হার ▪ মাছের চারা সংগ্রহ ও পরিবহন ▪ মাছের চারা মজুদের পদ্ধতি ▪ মাছের চারা মজুদের পর পর্যবেক্ষণ
১০	• পুকুরে মাছের চারা মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা ▪ মাছের খাদ্য ব্যবস্থাপনা ▪ মাছ মজুদের পর সার ব্যবস্থাপনা ▪ মাছের বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ ▪ পুকুরের তলা ঝাড়া বা পুকুর গোলানো (Bottom Raking)
১১	মাছের রোগব্যাধি ও তার প্রতিকার
১২	মাছ আহরণ ও আহরণের সময়সূচি

পশ্চিমবঙ্গ তথা সুন্দরবনের খাদ্য, পুষ্টি সুরক্ষা ও অর্থনীতিতে মাছ চাষের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এই এলাকার মানুষজনের জীবন ও জীবিকার সঙ্গে মাছ ওতোপ্রতো ভাবে জড়িত। আর এই জন্যেই বলা হয় **"মাছে ভাতে বাঙালি"**। সুন্দরবনের গ্রামাঞ্চলে বৃষ্টির জলেপুষ্ট অসংখ্য ছোট জলাশয় প্রায় প্রতিটি পরিবারের আশেপাশেই বিদ্যমান। এগুলোর মধ্যে প্রধানত পুকুর, ডোবা এবং খালজাতীয় জলাশয়, যা বর্ষাকালে বৃষ্টির জলে পুষ্ট এবং বছরের একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জল ধারণ করে। উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পিত মাছের চারার মজুদকরণ এবং সুষ্ঠ পরিচর্যার মাধ্যমে এই ছোট জলাশয়গুলোকে লাভজনক সম্মিলিত মাছচাষের আওতায় আনা সম্ভব। এর ফলে একদিকে যেমন পারিবারিক আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে তেমনি এবং অন্যদিকে পুষ্টিসমৃদ্ধ মাছের ফলন/উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। তাই সুন্দরবন অঞ্চলের ছোট জলাশয়গুলিতে পরিবেশবান্ধব টেকসই মাছ চাষের মাধ্যমে খাদ্য-পুষ্টি সুরক্ষা ও উপার্জনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যেতে পারে।

সম্মিলিত মাছচাষের যৌক্তিকতা:

পশ্চিমবঙ্গ তথা সুন্দরবনের মানুষেরা পুকুরে দীর্ঘদিন ধরে প্রথাগত পদ্ধতিতে প্রধানত বড়ো পোনা মাছ অর্থাৎ Indian Major Carp, যেমন - কাতলা (*Catla catla*), রুই (*Labeo rohita*), মৃগেল (*Cirrhinus mrigala*) এবং কিছু বিদেশি প্রজাতির মাছ যেমন - গ্রাস কার্প (*Ctenopharyngodon idella*), পাঙ্গাস (*Pangasius pangasius*), তেলাপিয়া (*Oreochromis niloticus*) কমন কার্প (*Cyprinus carpio*) এছাড়াও আরো বিভিন্ন ধরণের প্রজাতির মাছের চাষ করে থাকেন। এই মাছগুলো অন্তর্দেশীয় মাছ উৎপাদনে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে এবং এগুলো উচ্চ বাণিজ্যিক মূল্যের জন্য ব্যাপকভাবে চাষ করা হয়ে থাকে।

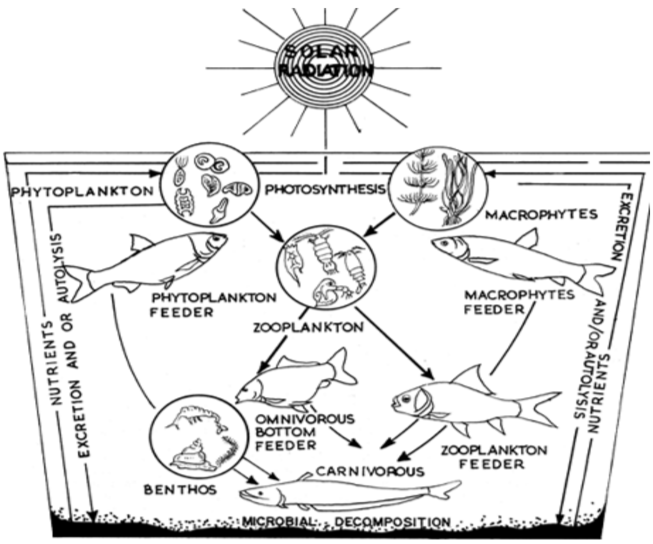

সম্মিলিত মাছ চাষের পুকুরের বাস্তুতন্ত্র
ছবির উৎস: FAO

অন্যদিকে, প্রাকৃতিকভাবে জলাশয়ে পাওয়া ছোট দেশীয় মাছ বা স্মল ইন্ডিজেনাস স্পিসিস (Small Indigenous Species - SIS) দীর্ঘদিন ধরে "আগাছা মাছ" (Weed Fish) হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় পুকুর থেকে অপসারণ করা হতো। কিন্তু গত দুই দশকের গবেষণায় দেখা গেছে যে, কার্পভিত্তিক মাছচাষের পুকুরে এইসব ছোট মাছের প্রজাতি যেমন - মৌরালা (*Amblypharyngodon mola*), সরপুঁটি (*Systomus sarana*), ট্যাংরা (*Mystus gulio*), পারশে (*Chelon parsia*) এবং মাগুর (*Clarias magur*) কে অন্তর্ভুক্ত করলে উৎপাদন ব্যবস্থা আরও কার্যকর, বৈচিত্র্যময় ও পরিবেশগতভাবে স্থিতিশীল হয়ে ওঠে।

এই সম্মিলিত মাছচাষ পদ্ধতিতে একদিকে যেমন পোনা মাছের বাজারজাতকরণের মাধ্যমে একটি বার্ষিক আয় নিশ্চিত হয়, ঠিক তেমনই অন্যদিকে দ্রুত বংশবিস্তারকারী SIS অর্থাৎ ছোট প্রজাতির মাছ সারা বছর গ্রামীণ পরিবারের জন্য সহজলভ্য, পুষ্টিসমৃদ্ধ ও নিয়মিত প্রাণীজ প্রোটিনের উৎস হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলে এই পদ্ধতি পারিবারিক পুষ্টি সুরক্ষা এবং অতিরিক্ত আয় বৃদ্ধিতে বিশেষভাবে সহায়ক।

পুষ্টি ও সুস্বাস্থ্যের প্রাকৃতিক উৎস হিসেবে ছোট দেশীয় মাছ:

ছোট দেশীয় মাছ বা SIS (Small Indigenous Species) তাদের উচ্চ পুষ্টিগুনের জন্য বর্তমানে বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। এদেরকে “পুষ্টি মাছ” (Nutrifish) ও বলা হয়, কারণ এসব মাছে সহজপাচ্য প্রাণীজ প্রোটিন, প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিড, ওমেগা - ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, ভিটামিন এবং বিভিন্ন খনিজ উপাদান প্রচুর পরিমাণে থাকে। এসব পুষ্টি উপাদান দৃষ্টিশক্তি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং স্বাস্থ্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সুন্দরবনের মানুষের দৈনন্দিন জীবনের খাদ্যতালিকায় ছোটো মাছ
ছবির উৎস: Anit Mondal

বড়ো পোনা জাতীয় মাছ অর্থাৎ IMC (যেমন – রুই, কাতলা, মৃগেল) প্রোটিনের ভালো উৎস হলেও, মৌরালা, সরপুঁটি ও ট্যাংরার মতো ছোট দেশীয় মাছের মধ্যে ভিটামিন – এ, আয়রন, জিঙ্ক এবং ক্যালসিয়ামের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি। যেহেতু এসব মাছ সাধারণত কাঁটাসহ সম্পূর্ণ খাওয়া হয়, তাই আমাদের শরীরে সহজেই অধিক ক্যালসিয়াম ও অন্যান্য অনুপুষ্টির আত্তীকরণ হয়। এছাড়া মাছের প্রোটিন উদ্ভিদজাত খাদ্যের তুলনায় আয়রন ও জিঙ্কের আত্তীকরণে বিশেষ সাহায্য করে। পারসে, শিং, ট্যাংরা ও মাগুরের মতো দেশীয় মাছ সুন্দরবনের মতো প্রতিকূল পরিবেশেও সহজে বেঁচে থাকতে পারে এবং পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ হওয়ায় এগুলো বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

তাই কার্পভিত্তিক (পোনাভিত্তিক) মাছচাষের সাথে ছোট দেশীয় মাছকে অন্তর্ভুক্ত করলে শুধু মাছের উৎপাদনই বাড়ে না, বরং পরিবারের খাদ্যতালিকায় পুষ্টির বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পায়, অপুষ্টি দূরীকরণে সহায়তা করে এবং গ্রামীণ পরিবারের খাদ্য ও পুষ্টি সুরক্ষা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কয়েকটি মাছের পুষ্টি গুনাগুন:

মাছের গোষ্ঠী	মাছের বাংলা নাম (প্রচলিত নাম)	বৈজ্ঞানিক নাম	ভিটামিন A (µg/100g))	ক্যালসিয়াম (mg/100g)	লৌহ (mg/100g)	জিঙ্ক (mg/100g)
ছোট দেশীয় মাছ (SIS)	মৌরালা	*Amblypharyngodon mola* (Hamilton, 1822)	134	459	3.91	3.4
	শিং বা শিঙ্গি	*Heteropneustes fossilis* (Bloch, 1794)	14.2	148	1.86	1.19
	নোনা ট্যাংরা (ট্যাংরা)	*Mystus gulio* (Hamilton, 1822)	19.5	171	2.13	1.22
	মাগুর	*Clarias magur* (Hamilton, 1822)	13.6	45.2	1.32	0.77
	সরপুঁটি	*Systomus sarana* (Hamilton, 1822)	30.2	159	0.74	0.81
বড় মাছের প্রজাতি (ভারতীয় ও বিদেশি কার্প)	রুই	*Labeo rohita* (Hamilton, 1822)	3.39	101	0.62	0.91
	কাতলা	*Labeo catla* (Hamilton, 1822)	4.54	186	0.93	1.25
	মৃগেল	*Cirrhinus mrigala* (Hamilton, 1822)	6.76	282	2.17	1
	গ্রাস কার্প	*Ctenopharyngodon idella* (Valenciennes, 1844)	15.6	23.6	0.81	0.49

কয়েকটি ছোট দেশীয় মাছের বৈশিষ্ট্য ও পরিচিতি:

ছোট দেশীয় মাছ:

মৌরালা বা মৌটি (*Amblypharyngodon mola*):

মৌরালা একটি ছোট দেশীয় মাছ (Small Indigenous Species - SIS), যা সুন্দরবন অঞ্চলের খাল, বিল, পুকুর ও অন্যান্য স্বাদু বা স্বল্প লবণাক্ত জলাশয়ে পাওয়া যায়। উচ্চ পুষ্টিগুণ, দ্রুত বংশবিস্তার এবং স্থানীয় পরিবেশের সঙ্গে ভালো অভিযোজন ক্ষমতার কারণে এটি সুন্দরবনের ছোট জলাশয়ভিত্তিক সম্মিলিত মাছচাষের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতি।

শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য:

দেহ ছোট, চ্যাপ্টা ও রুপালি বর্ণের। পিঠ সবুজাভ বা হালকা বাদামি এবং পেট রুপালি-সাদা। মুখ ছোট ও ঊর্ধ্বমুখী (Upturned mouth), চোখ তুলনামূলকভাবে বড় এবং পুচ্ছপাখনা দ্বিখণ্ডিত (Forked)।

মৌরালা মাছ
ছবির উৎস: Ms. Gunjan Karnatak, ICAR-CIFRI

খাদ্যাভ্যাস ও বাসস্থান:

মৌরালা প্রধানত পুকুরের মধ্য ও নিম্ন জলস্তরে বিচরণ করে। এরা জুপ্ল্যাঙ্কটন এবং ক্ষুদ্র ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন অর্থাৎ প্রাণী ও উদ্ভিদ কণা, সূক্ষ্ম জৈব কণা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক খাদ্য গ্রহণ করে।

প্রজনন বৈশিষ্ট্য:

মৌরালা সাধারণত নদীতে অথবা পুকুরেই স্বাভাবিকভাবে প্রজনন করতে পারে। বর্ষাকালে প্রজনন সর্বাধিক হলেও অনুকূল পরিবেশে বছরে একাধিকবার ডিম দেয় (Multiple spawning), ফলে দ্রুত বংশবিস্তার করে।

সম্মিলিত মাছচাষে মৌরালার গুরুত্ব:

বড় কার্প বা পোনা মাছ যে অতি সূক্ষ্ম প্রাকৃতিক খাদ্য সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করতে পারে না, মৌরালা সেই খাদ্য ব্যবহার করে পুকুরের প্রাকৃতিক খাদ্যের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে। পাশাপাশি এটি পরিবারের জন্য ভিটামিন-এ, ক্যালসিয়াম, আয়রন ও অন্যান্য অণুপুষ্টি উপাদানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস এবং পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সরপুঁটি (*Systomus sarana*):

সরপুঁটি একটি দেশীয় মিষ্টি জলের মাছ। সুন্দরবনের এক অতি পরিচিত মাছ, যা পুকুর, খাল, বিল এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক জলাশয়ে স্বাভাবিকভাবে পাওয়া যায়। দ্রুত বৃদ্ধি, পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন ক্ষমতা এবং ভালো বাজারমূল্যের কারণে এটি SIS–কার্প সম্মিলিত মাছচাষের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতি।

শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য:

দেহ মাঝারি আকারের, পাশ থেকে চাপা এবং রুপালি-সোনালি বর্ণের। শরীরের আঁশ বড় ও সুস্পষ্ট। পৃষ্ঠপাখনা (Dorsal fin)-এর শেষ অশাখাবিশিষ্ট কাঁটা (Last unbranched ray) শক্ত ও করাতের দাঁতের মতো খাঁজযুক্ত (Serrated), যা এই মাছের অন্যতম প্রধান পরিচয়।

সরপুঁটি মাছের চারা
ছবির উৎস: Ms. Gunjan Karnatak, ICAR-CIFRI

খাদ্যাভ্যাস ও বাসস্থান:

সরপুঁটি প্রধানত পুকুরের মধ্য ও তলদেশীয় জলস্তরে বিচরণ করে। এটি সর্বভুক (Omnivorous) প্রকৃতির মাছ এবং জলজ পোকামাকড়, ছোট অমেরুদণ্ডী প্রাণী, পচা জৈব পদার্থ (Detritus), শৈবাল (Algae) এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক খাদ্য গ্রহণ করে। খাদ্যের বৈচিত্র্যের কারণে পরিবর্তনশীল পরিবেশেও সহজে টিকে থাকতে পারে।

প্রজনন বৈশিষ্ট্য:

সরপুঁটির প্রজনন মৌসুম প্রধানত বর্ষাকাল। প্রাকৃতিক পরিবেশে সহজে প্রজনন করলেও, স্থির পুকুরে কৃত্রিম প্রজনন (Induced Breeding/Hypophysation) অথবা উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে এর প্রজনন করা যেতে পারে। তাছাড়া, এর চারা/বীজ সহজেই হ্যাচারী থেকে পাওয়া যায়।

সম্মিলিত মাছচাষে গুরুত্ব:

সরপুঁটি পুকুরের বিভিন্ন স্তরের প্রাকৃতিক খাদ্য ব্যবহার করে, ফলে কার্প মাছের সঙ্গে খাদ্যের প্রতিযোগিতা তুলনামূলকভাবে কম হয়। এছাড়া এর উচ্চ পুষ্টিগুণ, ভালো বাজারচাহিদা এবং অতিরিক্ত আয়ের সম্ভাবনা SIS – কার্প সম্মিলিত মাছচাষকে আরও লাভজনক ও পরিবেশবান্ধব করে তোলে।

ট্যাংরা (*Mystus gulio*):

ট্যাংরা একটি দেশীয় ক্যাটফিশ, যা সুন্দরবনের নদী, খাল, মোহনা, পুকুর এবং স্বল্প লবণাক্ত জলাশয়ে স্বাভাবিকভাবে পাওয়া যায়। এই প্রজাতির মাছের স্বাদ, উচ্চ পুষ্টিগুণ এবং ভালো বাজারমূল্যের কারণে এটি SIS – কার্প সম্মিলিত মাছচাষের জন্যে একটি উপযুক্ত প্রজাতি।

শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য:

দেহ লম্বাটে ও সামান্য চাপা, রঙ বাদামি থেকে ধূসর হয়ে থাকে। মুখের চারপাশে চার জোড়া লম্বা গোঁফ (Barbels) থাকে, যা এই মাছের প্রধান পরিচয়। পৃষ্ঠপাখনা ও বক্ষপাখনায় শক্ত কাঁটা (Spines) বিদ্যমান এবং লেজ দ্বিখণ্ডিত (Forked)।

খাদ্যাভ্যাস ও বাসস্থান:

এই মাছ সাধারণত দলবদ্ধভাবে পুকুরের তলদেশে বিচরণ করে। এই মাছের প্রধান খাদ্য হলো ক্ষুদ্র চিংড়ি ও ক্রাস্টেসিয়ান, পোকামাকড়ের লার্ভা, কাইরোনোমিড (Chironomid) লার্ভা এবং অন্যান্য তলদেশে বসবাসকারী ক্ষুদ্র প্রাণী।

প্রজনন বৈশিষ্ট্য:

এই নোনা ট্যাংরার প্রজননের মুখ্য সময় হলো বর্ষাকাল। প্রাকৃতিক জলাশয়ে এবং পুকুরে সহজে প্রজনন করলেও, বাণিজ্যিকভাবে সাধারণত কৃত্রিম প্রজনন (Induced Breeding) পদ্ধতিতে এর বীজ উৎপাদন করা সম্ভব।

সম্মিলিত মাছচাষে ট্যাংরার গুরুত্ব:

ট্যাংরা পুকুরের তলদেশে বসবাসকারী ক্ষুদ্র প্রাণী ও প্রাকৃতিক খাদ্য ব্যবহার করে, ফলে কার্প মাছের সঙ্গে খাদ্য প্রতিযোগিতা কম হয়। এছাড়া এর উচ্চ বাজারমূল্য, পুষ্টিগুণ এবং তলদেশের খাদ্যসম্পদের সঠিক ব্যবহার, সম্মিলিত মাছচাষের উৎপাদনশীলতাকে বৃদ্ধি করে।

পারশে (*Chelon parsia*):

পারশে (*Chelon parsia*) একটি দেশীয় নোনা জলের মাছ অর্থাৎ এইসব মাছ লবণতা সহ্য করতে পারে, যা সুন্দরবনের নদী, খাঁড়ি, মোহনা, ভেড়ি এবং স্বল্প লবণাক্ত থেকে স্বাদু জলাশয়ে স্বাভাবিকভাবে পাওয়া যায়। লবণাক্ততার তারতম্য সহ্য করার ক্ষমতা, দ্রুত বৃদ্ধি এবং উচ্চ বাজারমূল্যের কারণে এটি সুন্দরবনের জলাশয়ভিত্তিক SIS – কার্প সম্মিলিত মাছচাষের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতি।

পারশে মাছ
ছবির উৎস: Fish Base; Hasan, M.E.

শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য:

দেহ লম্বাটে ও রূপালি বর্ণের, পিঠ ধূসর-সবুজ এবং পেট রূপালি-সাদা। মাথা চ্যাপ্টা, মুখ ছোট এবং ঠোঁট তুলনামূলকভাবে মোটা। দেহে বড় আঁশ থাকে এবং লেজ গভীরভাবে দ্বিখণ্ডিত (Deeply forked), যা সহজেই এ মাছকে শনাক্ত করতে সাহায্য করে।

খাদ্যাভ্যাস ও বাসস্থান:

পারশে প্রধানত পুকুরের মধ্য ও তলদেশীয় জলস্তরে বিচরণ করে। এটি সর্বভুক (Omnivorous) প্রকৃতির মাছ এবং শ্যাওলা (Algae), ডায়াটম, ডেট্রিটাস (Detritus), জৈব পদার্থ, পেরিফাইটন এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক খাদ্য গ্রহণ করে। পুকুরের তলদেশে জমে থাকা জৈব পদার্থও খাবার হিসাবে গ্রহণ করে।

প্রজনন বৈশিষ্ট্য:

পারশে সাধারণত মোহনা ও উপকূলীয় লবণাক্ত জলাশয়ে বর্ষাকাল ও বর্ষা–পরবর্তী সময়ে প্রজনন করে। এরা সাধারণত পুকুরে স্বাভাবিকভাবে প্রজনন করে না; তাই চাষের জন্য সাধারণত প্রাকৃতিক উৎস বা হ্যাচারি থেকে উৎপাদিত চারা ব্যবহার করা হয়।

সম্মিলিত মাছচাষে পারশের গুরুত্ব:

পারশে পুকুরের প্রাকৃতিক শৈবাল, ডেট্রিটাস ও জৈব পদার্থ খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে, ফলে অন্যান্য কার্প মাছের সঙ্গে খাদ্য প্রতিযোগিতা কম হয়। এছাড়া লবণাক্ততার পরিবর্তন সহ্য করার ক্ষমতার কারণে সুন্দরবনের স্বল্প লবণাক্ত পুকুরে এটি সফলভাবে চাষ করা যায়। এছাড়াও এর উচ্চ বাজারদর, স্বাদ এবং প্রাকৃতিক খাদ্যের কার্যকর ব্যবহার সম্মিলিত মাছচাষের উৎপাদনশীলতা ও লাভজনকতা বৃদ্ধি করে।

পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে স্বল্প বিনিয়োগে বিকল্প জীবিকা হিসেবে: SIS – কার্প পলিকালচার

পুষ্টিগত সুবিধার পাশাপাশি, SIS – কার্প এর সম্মিলিত মাছচাষ সুন্দরবনের গ্রামীণ পরিবারের জন্য একটি লাভজনক ও কম মূলধনের পেশা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রচলিত বাণিজ্যিক মাছচাষে মোট উৎপাদন ব্যয়ের প্রায় ৬০ – ৮০ শতাংশ ব্যয় হয় কেবল মাছের খাবারের জন্য। ফলে অধিকাংশ ছোট ও প্রান্তিক চাষির পক্ষে সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক ভাবে খাদ্যনির্ভর নিবিড় মাছচাষ অর্থনৈতিক দিক থেকে অনেকাংশে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই কম খরচে অধিক উৎপাদন নিশ্চিত করতে বিকল্প বিজ্ঞানসম্মত মাছচাষ পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তাই SIS – কার্প এর সম্মিলিত মাছচাষ পদ্ধতি সুন্দরবনের গ্রামীণ জনজীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসেবে দেখা যেতে পারে। এই পদ্ধতিতে IMC যেমন – কাতলা, রুই, মৃগেল এবং গ্রাস কার্প বছরের শেষে বাজারে বিক্রির মাধ্যমে প্রধান আয়ের উৎস হিসেবে কাজ করে। অন্যদিকে, দ্রুত বংশবিস্তারকারী ছোট দেশীয় মাছ যেমন – মৌরালা, সরপুঁটি, নোনা ট্যাংরা, পারশে, শিঙ্গি এবং মাগুর পরিবারের নিয়মিত পুষ্টির চাহিদা পূরণের পাশাপাশি স্থানীয় বাজারে বিক্রির মাধ্যমে একটি অতিরিক্ত আয়ের সুযোগ তৈরী করে। সুস্বাদু ও উচ্চ পুষ্টিগুনসম্পন্ন হওয়ায়

এসব মাছের বাজার চাহিদা সবসময়ই ভালো এবং অনেক ক্ষেত্রে বড় পোনা মাছের তুলনায় কেজি প্রতি বেশি দামও পাওয়া যায়।

কিছু পরিমান মাছের আহরণ
ছবির উৎস: Anit Mondal

এই পদ্ধতির অন্যতম প্রধান সুবিধা হলো কম খাদ্য ব্যয়ে অধিক উৎপাদন। অধিকাংশ সম্পূরক খাদ্য বড় পোনা মাছের বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করা হয়, কিন্তু ছোট দেশীয় মাছের জন্যে আলাদা বা অতিরিক্ত খাদ্যের প্রয়োজন হয় না। এরা পুকুরে থাকা প্রাকৃতিক খাদ্য যেমন –প্ল্যাঙ্কটন, জৈব অবশেষ, ক্ষুদ্র জৈব কণা এবং পচনশীল জৈব পদার্থ ব্যবহার করে সহজেই বৃদ্ধি ও বংশবিস্তার করতে পারে।

সম্মিলিত মাছচাষে প্রতিটি প্রজাতি পুকুরের ভিন্ন ভিন্ন খাদ্যের স্তর ব্যবহার করে। ছোটো মাছ অতি সূক্ষ্ম প্ল্যাঙ্কটন ও ভাসমান জৈব কণা গ্রহণ করে, যা বড় পোনা মাছ ব্যবহার করতে পারে না। অন্যদিকে ট্যাংরা, শিং ও মাগুরের মতো মাছগুলি পুকুরের তলদেশে জমে থাকা জৈব অবশেষ, ক্ষুদ্র প্রাণী ও খাদ্যকণা ব্যবহার করে। ফলে অব্যবহৃত খাদ্য, পোনা মাছের বিপাকজাত বর্জ্য এবং জলে দ্রবীভূত খাদ্যকণা ছোটো দেশীয় মাছের খাদ্যে রূপান্তরিত হয়। এই প্রাকৃতিক জৈব পুনর্ব্যবহার (Biological Recycling) পদ্ধতির মাধ্যমে অতিরিক্ত খাদ্য ব্যবহার না করেই মোট মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, খাদ্যের ব্যবহার দক্ষতা (Feed Conversion Ratio, FCR) উন্নত হয় এবং উৎপাদন ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়।

এছাড়া ছোট দেশীয় মাছ পুকুরের পরিবেশ সুস্থ রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এরা অতিরিক্ত প্ল্যাঙ্কটন ও জৈব বর্জ্য নিয়মিত গ্রহণ করায় জলেও পুষ্টি উপাদানের ভারসাম্য বজায়

থাকে এবং জৈব পদার্থের অতিরিক্ত সঞ্চয় কমে যায়। এর ফলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল থাকে এবং জলের গুণগত মানের হটাৎ খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা অনেকাংশে কমে যায়। একই সঙ্গে মাছের রোগের ঝুঁকি হ্রাস পায়, ব্যবস্থাপনা ব্যয় কমে, যা ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের জন্য মাছচাষ ব্যবস্থা আরও লাভজনক, পরিবেশবান্ধব ও টেকসই হয়ে ওঠে।

পুকুরের প্রকারভেদ:

মাছচাষের সফলতা অনেকাংশে উপযুক্ত পুকুর নির্বাচন, প্রস্তুতি এবং সঠিক ব্যবস্থাপনার ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। মাছের জীবনচক্রের প্রতিটি ধাপে (ডিমপোনা, ধানীপোনা, চারাপোনা ও বাজারজাত মাছ) পরিবেশগত চাহিদা ভিন্ন হওয়ায় একই ধরনের পুকুর সব পর্যায়ের মাছের জন্য উপযুক্ত নয়। তাই উৎপাদনের উদ্দেশ্য, মাছের বয়স, চাষের সময়কাল এবং ব্যবস্থাপনার সুবিধা বিবেচনা করে পুকুরকে সাধারণত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে।

নার্সারি বা আঁতুড় পুকুর (Nursery Pond):

প্রস্তাবিত আয়তন: ০.০২ - ০.২০ হেক্টর

উদ্দেশ্য: ডিমপোনা বা সদ্য ফোটা পোনাকে ধানীপোনা (Fry) পর্যায় পর্যন্ত প্রতিপালনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

বৈশিষ্ট্য: অগভীর (প্রায় ১.০ - ১.২ মিটার), সহজে জল নিয়ন্ত্রণযোগ্য এবং প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনের উপযোগী হওয়া উচিত। শত্রু ও আগাছামুক্ত রাখা অত্যন্ত জরুরি।

পালন পুকুর (Rearing Pond):

প্রস্তাবিত আয়তন: ০.১ - ০.৮০ হেক্টর

উদ্দেশ্য: ধানীপোনাকে প্রতিপালন করে চারাপোনা (Fingerling) উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

বৈশিষ্ট্য: পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য, নিয়মিত সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ এবং জলের গুণগত মান বজায় রাখা প্রয়োজন। এই পর্যায়ে মাছের দ্রুত ও সুস্থ বৃদ্ধি নিশ্চিত করা হয়।

মজুত পুকুর (Stocking বা Grow-out Pond):

প্রস্তাবিত আয়তন: ০.৪ - ৩.০০ হেক্টর (বা তার বেশি)

ব্যবহার: চারাপোনা মজুত করে বাজারজাত উপযোগী আকার পর্যন্ত প্রতিপালন করা হয়।

বৈশিষ্ট্য: সারা বছর পর্যাপ্ত জল, ১.৫ - ২.৫ মিটার গভীরতা, শক্ত বাঁধ, নিয়মিত জলের গুণমান পর্যবেক্ষণ এবং সুষম খাদ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এই পুকুরেই মূল বাণিজ্যিক উৎপাদন সম্পন্ন হয়।

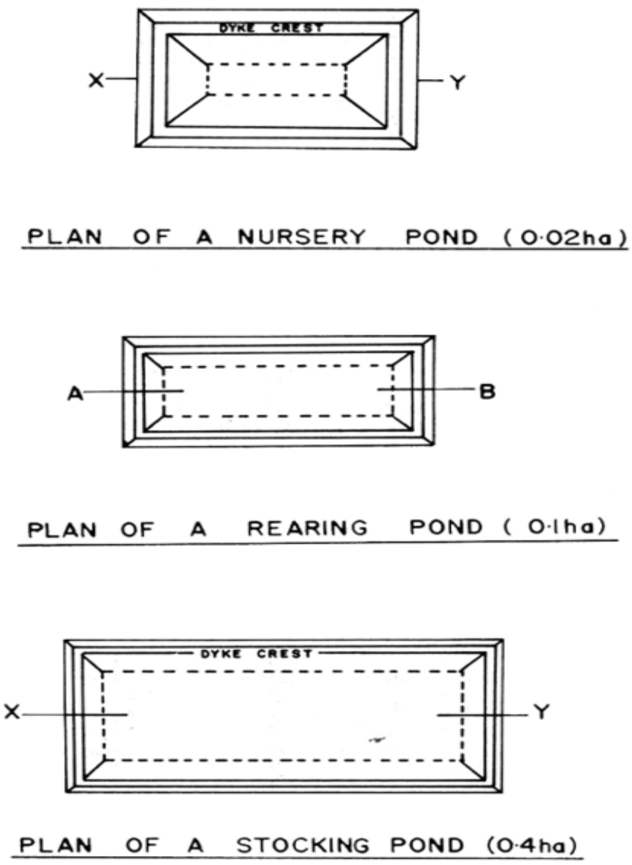

বিভিন্ন প্রকারের পুকুর
ছবির উৎস: FAO

মাছচাষের পদ্ধতি:

মাছচাষের উদ্দেশ্য, জলাশয়ের ধরন, জলের গুনাগুন এবং বাজারের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন পদ্ধতিতে মাছ চাষ করা হয়ে থাকে।

১) একক মাছ চাষ (Monoculture):

একটি পুকুরে শুধুমাত্র একটি প্রজাতির মাছ চাষ করাকে একক চাষ বলা হয়। যেমন: চিংড়ি, তেলাপিয়া, পাঙ্গাস অথবা গ্রাসকার্পের একক চাষ।

২) মিশ্র চাষ (Composite fish culture):

একই পুকুরে বিভিন্ন খাদ্যাভ্যাস ও জলের ভিন্ন স্তরে বসবাসকারী একাধিক প্রজাতির মাছ একসঙ্গে একটি নির্দিষ্ট পরিমানে চাষ করাকে মিশ্র চাষ বলা হয়। যেমন: কাতলা, রুই, মৃগেল, ও বিদেশী প্রজাতির মাছ যেমন সিলভার কার্প, গ্রাসকার্প ইত্যাদি এর একসাথে চাষ করাকে মিশ্র চাষ বলা হয়ে থাকে।

৩) সম্মিলিত মাছ চাষ:

একই পুকুরে খাদ্যাভ্যাস ও জলের খাদ্যস্তরের ভিত্তিতে একাধিক প্রজাতির মাছ একসঙ্গে চাষ করাকে সম্মিলিত মাছের চাষ বলা হয়। এই পদ্ধতিতে কাতলা, রুই, মৃগেল, ও বিদেশী প্রজাতির মাছ যেমন সিলভার কার্প, গ্রাসকার্প ইত্যাদি এর পাশাপাশি ছোটো দেশীয় প্রজাতির মাছ যেমন সরপুঁটি, মৌরালা, পারশে, ট্যাংরা, শিং, মাগুর চাষ করা হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিতে সঠিক প্রজাতি নির্বাচনের মাধ্যমে পুকুরের খাদ্যের সর্বোচ্চ ব্যবহার করা যেতে পারে।

পুকুরে মাছ চাষের ব্যবস্থাপনা:

মাছ চাষের সম্পূর্ণ কার্যক্রমকে পুকুর প্রস্তুতি থেকে শুরু করে মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণ পর্যন্ত প্রধানত তিনটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়ে থাকে। যথা –

১) মাছ মজুদ পূর্ববর্তী ব্যবস্থাপনা

২) মাছ মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা

৩) মাছের মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

১) মাছ মজুদ পূর্ববর্তী ব্যবস্থাপনা:

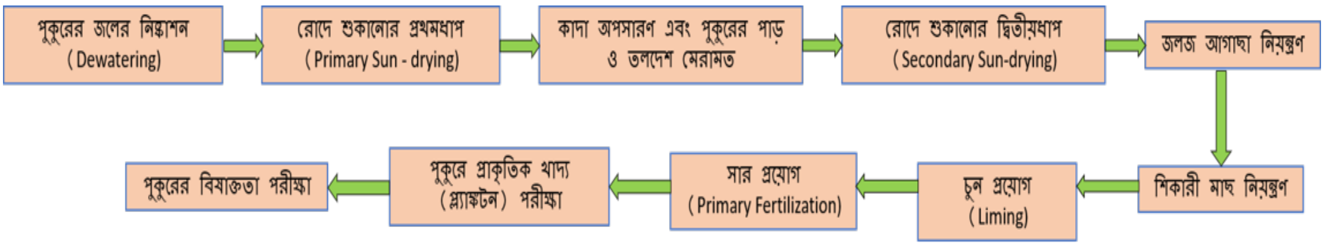

SIS – কার্প সম্মিলিত মাছচাষে ভালো উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য পুকুরের সঠিক প্রস্তুতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নতুন চাষ শুরু করার আগে অর্থাৎ ফাল্গুন – চৈত্র মাসে পুকুর পরিষ্কার, পলি অপসারণ, পুকুরে পাড় এবং তলদেশ মেরামত করে পর্যাপ্ত সময় রোদে শুকিয়ে নিতে হবে, যার ফলে রোগজীবাণু, ক্ষতিকর গ্যাস ও অবাঞ্ছিত জীবের পরিমাণ কমে যায় এবং পুকুরের পরিবেশ মাছচাষের জন্য উপযোগী হয়ে ওঠে।

নতুন পুকুর প্রস্তুতির ক্ষেত্রে:

পুকুরের জলের নিষ্কাশন (Dewatering):

- মাছচাষ শুরুর আগে পুকুরের সমস্ত জল সম্পূর্ণ বের করে দিতে হবে।
- জল নিষ্কাশনের পর পুকুরের তলদেশ থেকে সব ধরণের নোংরা আসবাবপত্র, পলি, আগাছা ও শিকারী মাছ অপসারণ করতে হবে।
- সুন্দরবনের বৃষ্টিনির্ভর পুকুরে যেখানে সম্পূর্ণ জল বের করা সম্ভব নয়, সেখানে যতটা সম্ভব জল কমিয়ে পুকুর পরিষ্কার করতে হবে।

পুকুর শুকনো করা
ছবির উৎস: Anit Mondal

রোদে শুকানোর প্রথমধাপ (Primary Sun – drying):

- জল নিষ্কাশনের পর পুকুরের তলদেশকে ৭ – ৮ দিন রোদে শুকাতে হবে।
- রোদে শুকানোর ফলে মাটিতে ফাটল সৃষ্টি হয়, যা মাটির মধ্যে জমে থাকা ক্ষতিকর গ্যাস বের হতে সাহায্য করে।
- একই সঙ্গে সূর্যের তাপে রোগজীবাণু, পরজীবী, ক্ষতিকর অণুজীব এবং অবাঞ্ছিত জলজ প্রাণীর সংখ্যা অনেকাংশে কমে যায়।
- মাটিতে জমে থাকা জৈব পদার্থের পচন ও জারণ (Oxidation) ত্বরান্বিত হয়, ফলে পুকুরের তলদেশ আরও উর্বর ও স্বাস্থ্যকর হয়।

কাদা অপসারণ এবং পুকুরের পাড় ও তলদেশ মেরামত:

- পুকুর শুকিয়ে ফেলার পর পুকুরপাড়ের ঝোপঝাড় ও অতিরিক্ত গাছের ডালপালা পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। এতে পুকুরের জলে পর্যাপ্ত সূর্যালোক প্রবেশ করতে পারবে, শিকারী প্রাণীর আশ্রয় কমবে এবং পচা পাতার কারণে ক্ষতিকর গ্যাস সৃষ্টি হওয়ার ঝুঁকি হ্রাস পাবে।

- এরপর পুকুরের তলদেশে জমে থাকা অতিরিক্ত পলি, কাদা ও জৈব আবর্জনা অপসারণ করতে হবে। কারণ দীর্ঘদিন পলি জমে থাকলে তা থেকে অ্যামোনিয়া ও হাইড্রোজেন সালফাইডের মতো ক্ষতিকর গ্যাস উৎপন্ন হতে পারে, যা মাছের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।
- এরপর অতিরিক্ত মাটি অপসারণ করে পুকুরের পাড় ভাঙা বা কোনো গর্ত থাকলে তা মেরামত করতে হবে যারফলে পুকুরের গভীরতা বৃদ্ধি পাবে এবং পুকুরের পাড় ডুবে যাওয়ার সম্ভবনা থাকলে পুকুরের পাড় উঁচু করতে হবে।
- অপসারিত পলি অত্যন্ত উর্বর হওয়ায় তা পুকুরের বাঁধ মেরামত, সবজি চাষ বা কৃষিজমিতে জৈব সার হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে, ফলে অতিরিক্ত অর্থনৈতিক সুবিধাও পাওয়া যায়।
- পুকুরের তলদেশ সমান করতে হবে কারণ পুকুরের তলদেসহ অসমান করলে পরবর্তীতে মাছ ধরতে অসুবিধে হবে।

রোদে শুকানোর দ্বিতীয়ধাপ (Secondary Sun-drying):

- মাটি অপসারণ ও বাঁধ মেরামতের পর পুকুর আবার ৭ - ৮ দিন রোদে শুকাতে হবে।
- এতে মাটি আরও শক্ত ও স্থিতিশীল হয় এবং রোগজীবাণু ধ্বংস হয়ে পুকুরের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত হয়।
- এরপর চুন প্রয়োগ, সার প্রয়োগ এবং পুকুরে জল ভরার মাধ্যমে পরবর্তী ধাপের প্রস্তুতি শুরু করতে হবে।

সুন্দরবনের মাছ - চাষী ভাইদের জন্য বিশেষ কিছু পরামর্শ:

- বর্ষা শেষ হওয়ার পর বা শীতের শুরুতে পুকুর সংস্কারের কাজ করা সবচেয়ে উপযুক্ত।
- জোয়ার-ভাটা বা লবণাক্ত জল প্রবেশের সম্ভাবনা থাকলে পুকুর সম্পূর্ণ শুকানোর সময় ইনলেট ও আউটলেট ভালোভাবে বন্ধ রাখতে হবে।
- পুকুরের তলদেশে অতিরিক্ত পলি জমতে না দেওয়ার জন্য প্রতি ২ - ৩ বছর অন্তর অন্তত একবার পলি অপসারণ করা উচিত।
- পুকুর শুকানোর সময় বাঁধের ফাটল, ইঁদুরের গর্ত এবং ক্ষতিগ্রস্ত অংশ মেরামত করলে পরবর্তী চাষে ঝুঁকি অনেক কমে যায়।

পুকুরে জল ভরাট (Water Filling):

পুকুর প্রস্তুতির প্রাথমিক ধাপ গুলি যেমন: পুকুর শুকানো, প্রাথমিক চুন ও সার প্রয়োগ সম্পন্ন হওয়ার পর পুকুরে ধীরে ধীরে পরিষ্কার ও দূষণমুক্ত জল প্রবেশ করাতে হবে। জল একবারে না ভরে ধাপে ধাপে ভরাট করলে পুকুরের তলদেশের মাটি ও প্রয়োগকৃত চুন-সারের কার্যকারিতা বজায় থাকে এবং প্ল্যাঙ্কটন (প্রাকৃতিক খাদ্য) উৎপাদনের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়। সাধারণত পুকুরে ১.২ - ১.৫ মিটার (প্রায় ৪ - ৫ ফুট) গভীরতা পর্যন্ত জল রাখা উপযুক্ত। সুন্দরবন অঞ্চলে জোয়ারের জল ব্যবহার করলে ইনলেটের মুখে সূক্ষ্ম জাল দিয়ে বেঁধে দিতে হবে, যাতে শিকারী মাছ, কাঁকড়া, ও অন্যান্য শিকারি প্রাণী পুকুরে প্রবেশ করতে না পারে।

মনে রাখবেন:

- পুকুরে পরিষ্কার ও দূষণমুক্ত জল ঢোকাতে হবে।
- একবারে সম্পূর্ণ জল না ভরে ধীরে ধীরে ছেঁকে জল ভরাট করতে হবে।
- ইনলেট ও আউটলেটে সূক্ষ্ম জাল ব্যবহার করতে হবে।

পুরানো পুকুর প্রস্তুতির ক্ষেত্রে:

জলজ আগাছা নিয়ন্ত্রণ:

জলজ আগাছা পুকুরের উৎপাদনশীলতা হ্রাসের অন্যতম প্রধান কারণ। সুন্দরবন অঞ্চলের অধিকাংশ পুকুরে বর্ষাকালের পর কচুরিপানা, হেলেঞ্চা, শুষনি, শালুক, কলমিলতা প্রভৃতি জলজ আগাছার দ্রুত বিস্তার ঘটে। তাই মাছ মজুদের আগে এবং চাষকালীন সময়ে নিয়মিত আগাছা নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সুন্দরবনের কিছু জলজ আগাছা
ছবির উৎস: Ms. Gunjan Karnatak, ICAR-CIFRI

জলজ আগাছার ক্ষতিকর প্রভাব:

- জলাশয়ের ওপর অতিরিক্ত ছায়া সৃষ্টি করে, ফলে সূর্যালোক জলের মধ্যে ঠিক পৌঁছাতে পারে না এরফলে ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন (প্রাকৃতিক খাদ্য) এর উৎপাদন কমে যায়।
- জলের পুষ্টি উপাদান ও দ্রবীভূত অক্সিজেন (DO) কমিয়ে ফেলে ফলস্বরূপ মাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। এছাড়াও মাছের চলাচল, খাদ্য গ্রহণ এবং স্বাভাবিক আচরণে বাধা সৃষ্টি করে
- রোগজীবাণু, পোকামাকড়, সাপ, ব্যাঙ ও অন্যান্য ক্ষতিকর প্রাণীর আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে।
- মাছ ধরা, খাদ্য প্রয়োগ এবং পুকুরের দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনা কঠিন হয়ে পড়ে।
- অতিরিক্ত আগাছা পচে গেলে জলে অক্সিজেনের ঘাটতি তৈরি হয় এছাড়াও পুকুরে বিষাক্ত গ্যাসের সৃষ্টি করে এবং মাছ মারা যাওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়।

জলজ আগাছা নিয়ন্ত্রণের উপায়:

১. যান্ত্রিক পদ্ধতি:

- কচুরিপানা, শালুক, কলমিলতা ও অন্যান্য আগাছা নিয়মিত হাতে, রেক (Rake), বাঁশ বা লোহার চেইনের সাহায্যে পরিষ্কার করা যেতে পারে।
- অপসারিত আগাছা ফেলে না রেখে কম্পোস্ট তৈরি করে জৈব সার হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

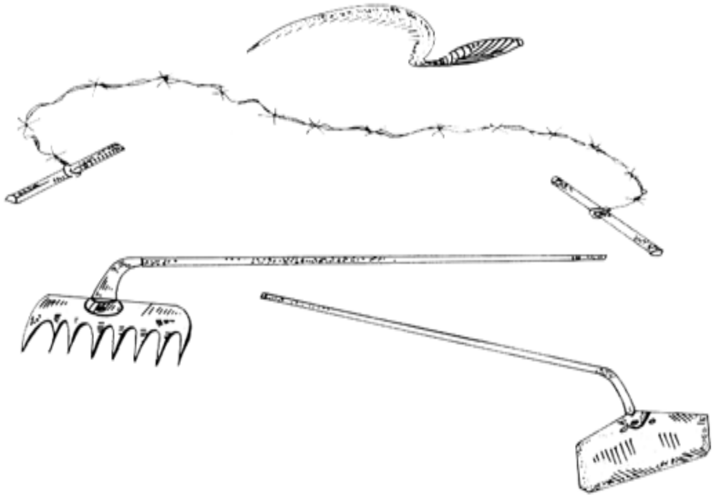

জলজ আগাছা নিয়ন্ত্রণের কয়েকটি যন্ত্রপাতি
ছবির উৎস: FAO

২. জৈবিক পদ্ধতি

- যেখানে উপযুক্ত, সেখানে গ্রাস কার্প (*Ctenopharyngodon idella*) মজুত করে কিছু জলজ আগাছা প্রাকৃতিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- এছাড়াও কিছু আগাছা যেমন: ছোট কুটি পানা, এজোলা অল্প পরিমানে সরপুঁটি এবং গ্রাসকার্প মাছের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- তবে অতিরিক্ত আগাছা থাকলে শুধুমাত্র গ্রাস কার্পের ওপর নির্ভর না করে যান্ত্রিক পরিষ্কারও করতে হবে।

৩. রাসায়নিক পদ্ধতি (শুধুমাত্র বিশেষ ক্ষেত্রে):

- আগাছার প্রকোপ অত্যন্ত বেশি হলে এবং অন্য পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণ সম্ভব না হলে মৎস্য বিশেষজ্ঞের পরামর্শে রাসায়নিক ব্যবহার করা যেতে পারে।
  - সোডিয়াম আর্সেনাইট: ৩ - ৬ ppm
  - কপার সালফেট (শৈবাল নিয়ন্ত্রণে): ০.২৫ - ০.৫ ppm
  - কপার সালফেট (pH ৬.০ করার পর): ১০ ppm

সতর্কতা: রাসায়নিক প্রয়োগের পর মৃত আগাছা দ্রুত পুকুর থেকে অপসারণ করতে হবে। পচে গেলে পুকুরের দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা কমে যায় এবং মাছের মৃত্যুর ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়।

মনে রাখবেন: আগাছামুক্ত পুকুরে সূর্যালোক, প্রাকৃতিক খাদ্য এবং দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, ফলে মাছের বৃদ্ধি ভালো হয় এবং উৎপাদনও বাড়ে।

সুন্দরবনের মাছ - চাষী ভাইদের জন্য বিশেষ কিছু পরামর্শ:

- বর্ষাকাল ও জোয়ার-ভাটার পরে পুকুরে আগাছার বিস্তার বেশি হয়, তাই এ সময় নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও পরিষ্কার করা প্রয়োজন।
- পুকুরের পাড় পরিষ্কার রাখতে হবে এবং অতিরিক্ত ঝোপঝাড় অপসারণ করতে হবে, যাতে সাপ ও অন্যান্য শিকারি প্রাণীর আশ্রয় কমে।

পরিবেশ ও মাছের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে যান্ত্রিক ও জৈবিক পদ্ধতিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে; রাসায়নিক পদ্ধতি শুধুমাত্র প্রয়োজন হলে ব্যবহার করতে হবে।

শিকারী মাছ নিয়ন্ত্রণ:

সফল SIS - কার্প সম্মিলিত মাছচাষের জন্য মাছ মজুদের আগে পুকুর থেকে শিকারী (Predatory) মাছ সম্পূর্ণরূপে অপসারণ করা অত্যন্ত জরুরি। এ ধরনের মাছ চাষযোগ্য মাছের চারাপোনা খেয়ে ফেলে, খাদ্য ও বাসস্থানের জন্য প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করে এবং উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দেয়। সাধারণত সুন্দরবন অঞ্চলে পুকুরে বর্ষাকাল, জোয়ার-ভাটা এবং খাল - নদীর সংযোগের মাধ্যমে এ ধরনের মাছ সহজেই পুকুরে প্রবেশ করতে পারে। তাই প্রতি চাষের মৌসুমের শুরুতে এদের নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক।

শিকারী মাছের ক্ষতিকর প্রভাব:

- এই ধরণের মাছ গুলির খাদ্যাভ্যাস মাংসাশী হওয়ার কারণে এরা চাষযোগ্য মাছের ডিম, ছোট পোনা খেয়ে ফেলে, ফলে বেঁচে থাকার হার (Survival Rate) অনেকাংশে কমে যায়।
- খাদ্য ও আশ্রয় দখল করে চাষযোগ্য মাছের সঙ্গে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করে, ফলে মাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।
- ○ পুকুরের উৎপাদনশীলতা ও লাভের পরিমান অনেকাংশে কমে যায়।

সুন্দরবনের পুকুরে দেখা যায় এমন কয়েকটি শিকারী মাছ: শোল, গজাল, বোয়াল, চিতল, ল্যাটা এবং ফলুই ও অন্যান্য মাছ।

শিকারী মাছ নিয়ন্ত্রণের উপায়:

১. পুকুর শুকিয়ে ফেলা (সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি):

- পুকুর সম্পূর্ণ শুকিয়ে ফেললে শিকারী ও অন্যান্য অবাঞ্চিত মাছ তথা প্রাণী অর্থাৎ যেগুলি মাছ চাষের উপযুক্ত নয় তা সহজেই নির্মূল করা যায়।
- বিভিন্ন ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ ও শামুক - ঝিনুক দূর করা যায়
- একই সঙ্গে জলজ আগাছা, রোগজীবাণু ও ক্ষতিকর জীবও অনেকাংশে ধ্বংস হয়।

২. ঘন ফাঁসের জাল টানা:

- ✓ পুকুর সম্পূর্ণ শুকানো সম্ভব না হলে মাছ মজুদের আগে ঘন ফাঁসের জাল বারবার টেনে শিকারি মাছ অপসারণ করতে হবে।

ঘন ফাঁসের জাল টানা
ছবির উৎস: Anit Mondal

৩. জৈবিক পদ্ধতি:

পুকুর শুকানো বা জাল টানার পরও যদি শিকারী মাছ থেকে যায়, তাহলে মাছ ছাড়ার ১০ – ১৫ দিন আগে নিম্নলিখিত জৈব উপাদান ব্যবহার করা যেতে পারে, যথা:

- ✓ মহুয়া খৈল (Mahua Oil Cake): ২,০০০ – ২,৫০০ কেজি/হেক্টর
- ✓ ডেরিস মূলের গুঁড়ো (Derris Root Powder) অর্থাৎ রোটেনন: ২৫ কেজি/হেক্টর

মহুয়া খৈল প্রয়োগের পদ্ধতি:

- ✓ প্রয়োজনীয় পরিমাণ মহুয়া খৈল (২,০০০ – ২,৫০০ কেজি/হেক্টর) পরিষ্কার জলে ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে।
- ✓ এরপর ভেজানো খৈল ভালোভাবে নেড়ে একধরণের থকথকে মিশ্রণ (Slurry) তৈরি করতে হবে।
- ✓ সকাল বা বিকেলের ঠান্ডা সময়ে ওই মিশ্রণটিকে পুকুরের সর্বত্র সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে।
- ✓ প্রয়োগের পর ১০ – ১৫ দিন অপেক্ষা করতে হবে, যাতে বিষক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে দূর হয়।

মহুয়া খৈলের বিশেষ সুবিধা: এটি প্রথমে অবাঞ্ছিত ও শিকারী মাছ নিধন করে এবং পরে পচে জৈব সারে পরিণত হয় যা পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য (Plankton) উৎপাদনে সহায়তা করে।

৪. রাসায়নিক পিসিসাইড (শুধুমাত্র বিশেষজ্ঞের পরামর্শে):

- প্রয়োজনে নিম্নলিখিত রাসায়নিক ব্যবহার করা যেতে পারে:

✓ ব্লিচিং পাউডার: ৩৫০ কেজি/হেক্টর

✓ ইউরিয়া - ব্লিচিং পাউডার সমন্বিত প্রয়োগ

✓ অ্যামোনিয়া-ভিত্তিক প্রয়োগ: ১০ মি.গ্রা. নাইট্রোজেন/লিটার

সতর্কতা:

- রাসায়নিক ব্যবহার শুধুমাত্র প্রশিক্ষিত মৎস্য বিশেষজ্ঞের পরামর্শে করতে হবে।
- এগুলি ব্যবহার এর আগে নাকে - মুখে গামছা বেঁধে নিতে হবে এবং ছিটানোর সময় বাতাসের অনুকূলে ছিটাতে হবে।
- এই ধরণের রাসায়নিক ছোট বাচ্চাদের থেকে দূরে রাখতে হবে।
- **মরা এবং ভেসে ওঠা মাছ গুলি পুকুর থেকে জাল দিয়ে দ্রুত সরিয়ে ফেলতে হবে এবং এই মরা মাছ গুলিকে কোনোভাবেই খাওয়া যাবে না।**

মনে রাখবেন: মাছ মজুতের আগে শিকারী মাছ সম্পূর্ণ নির্মূল করা গেলে পোনার বেঁচে থাকার হার বৃদ্ধি পায়, উৎপাদন বাড়ে এবং মাছচাষ অধিক লাভজনক হয়।

সুন্দরবনের চাষী ভাইদের জন্যে বিশেষ কিছু পরামর্শ:

- সুন্দরবনের অনেক পুকুর বর্ষাকালে খাল বা নদীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায়। ফলে বন্য মাছ ও অন্যান্য শিকারী মাছ সহজেই প্রবেশ করতে পারে। তাই বর্ষা শেষে মাছ মজুদের আগে অবশ্যই পুকুর পরীক্ষা করতে হবে।
- পুকুরের ইনলেট ও আউটলেটে সূক্ষ্ম জাল দিয়ে বেঁধে দিতে হবে, যাতে বাইরের অবাঞ্ছিত শিকারী মাছ প্রবেশ করতে না পারে।
- বাঁধ ভেঙে যাওয়া বা বন্যার পরে পুনরায় পুকুরে শিকারী মাছ প্রবেশ করেছে কি না তা জাল টেনে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।
- পরিবেশবান্ধব মাছচাষের জন্য পুকুর শুকানো, জাল টানা এবং মহুয়া খৈল ব্যবহারকে অগ্রাধিকার দিতে হবে; রাসায়নিক পদ্ধতি শুধুমাত্র প্রয়োজন হলে গ্রহণ করতে হবে।

চুন প্রয়োগ (Liming):

পুকুর প্রস্তুতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো চুন প্রয়োগ। চুন মাটির অম্লতা (pH) নিয়ন্ত্রণ করে, জলের গুণগত মান উন্নত করে এবং পুকুরকে মাছচাষের জন্য উপযোগী করে তোলে। এছাড়া এটি রোগজীবাণু ও ক্ষতিকর জীবের সংখ্যা কমাতে সাহায্য করে এবং প্রাকৃতিক খাদ্য (প্ল্যাঙ্কটন) উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

চুন প্রয়োগের সময়:

- ✓ পুকুরে মাছ মজুদের ৭ - ১০ দিন আগে পুকুরে চুন প্রয়োগ করতে হবে।
- ✓ পুকুর প্রস্তুতির সময় মোট প্রয়োজনীয় চুনের এক-তৃতীয়াংশ (⅓) প্রয়োগ করা উচিত।
- ✓ অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশ (⅔) চুন মাছচাষ চলাকালীন সমান ৮–১০ ভাগে ভাগ করে প্রতি ১৫ - ৩০ দিন অন্তর প্রয়োগ করলে জলে গুণগত মান ভালো থাকে।

পুকুরে চুনের প্রয়োগ
ছবির উৎস: Anit Mondal

চুন প্রয়োগের পদ্ধতি:

শুকনো পুকুরে:

- প্রয়োজনীয় পরিমাণ চুন পুকুরের তলদেশ ও বাঁধে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে।

জলযুক্ত পুকুরে:

- চুন একটি প্লাস্টিক, মাটির বা কংক্রিটের পাত্রে রাতভর জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে।
- পরদিন চুন সম্পূর্ণ ঠান্ডা হলে ভালোভাবে নেড়ে দুধের মতো মিশ্রণ (Lime slurry) তৈরি করতে হবে।
- এরপর সকাল বা বিকেলের দিকে পুকুরের চারদিকে সমানভাবে ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

পুকুরে চুন প্রয়োগের উপকারিতা গুলি নিম্নলিখিত:

- চুন ক্ষতিকর পোকামাকড় ও রোগজীবাণু ধ্বংস করতে সাহায্য করে অর্থাৎ জীবাণুনাশক হিসেবে কাজ করে।
- মাটির ও জলের গুণগতমান বজায় রাখতে সাহায্য করে।
- মাটির খনিজের পরিমান বজায় রাখে।
- মাটিতে অম্লতার মাত্রা অর্থাৎ pH বজায় রাখতে সাহায্য করে।
- পুকুরের জৈবিক উৎপাদনশীলতা বাড়ায়।
- চুন প্রয়োগের ফলে পুকুরের জলে বিষাক্ত গ্যাস নষ্ট হয়।

মাটির pH	চুন প্রয়োগের হার (কেজি প্রতি হেক্টর)
৪.০ – ৪.৫	১০০০
৪.৫ – ৫.৫	৭০০
৫.৫ – ৬.৫	৫০০
৬.৫ – ৭.৫	২০০

চুন প্রয়োগের মাত্রা

সুন্দরবনের মাছ - চাষী ভাইদের জন্য বিশেষ কিছু পরামর্শ:

- সুন্দরবনের অধিকাংশ পুকুরে বর্ষাকালে অতিবৃষ্টি ও জোয়ার-ভাটার কারণে জলের pH পরিবর্তিত হয়ে থাকে। তাই বছরে অন্তত ২ – ৩ বার মাটি ও জলের pH পরীক্ষা করে প্রয়োজন অনুযায়ী চুন প্রয়োগ করা করতে হবে।
- বৃষ্টির ঠিক আগে বা প্রবল বৃষ্টির সময় চুন প্রয়োগ না করাই ভালো, কারণ এতে চুন ধুয়ে গিয়ে কার্যকারিতা কমে যায়।
- চুন ও রাসায়নিক সার বা জৈব সার একই দিনে প্রয়োগ করবেন না। সাধারণত চুন প্রয়োগের ৫–৭ দিন পরে সার প্রয়োগ করলে সর্বোত্তম ফল পাওয়া যায়।

সার প্রয়োগ (Primary Fertilization):

মাছচাষে অধিক উৎপাদন নিশ্চিত করতে পুকুরে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য (Natural Food) উৎপাদন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রাকৃতিক খাদ্যের মূল উৎস হলো ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন (Phytoplankton) অর্থাৎ উদ্ভিদকণা ও জুপ্ল্যাঙ্কটন (Zooplankton) অর্থাৎ প্রাণীকণা। পুকুরে সঠিকভাবে সার প্রয়োগ করলে নাইট্রোজেন (N) ও ফসফরাস (P)-এর মতো প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান বৃদ্ধি পায়, যা ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনের উৎপাদন বাড়ায়। পরবর্তীতে এই ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনকে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে জুপ্ল্যাঙ্কটনের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এই প্রাকৃতিক খাদ্য বিশেষ করে ছোটো দেশীয় মাছ, মাছের পোনা ও বাড়ন্ত মাছের দ্রুত বৃদ্ধি এবং সুস্থ বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সারের ধরণ:

সার সাধারণত দুই ধরণের হয়ে থাকে, যথা: ১) জৈব সার ২) রাসায়নিক/অজৈব সার

জৈব সার (Organic Fertilizer):

জৈব সার পুকুরে ধীরে ধীরে পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করে এবং উপকারী অণুজীবের কার্যকলাপ বৃদ্ধি করে। এর ফলে পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং জলজ পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে।

সাধারণত ব্যবহৃত জৈব সার:

- খৈল, কম্পোস্ট, চিটা গুড়, ইস্ট ইত্যাদির মিশ্রণ একটি নির্দিষ্ট পরিমাপে তৈরী করে।
- গোরুর গোবর (মাছ চাষের পুকুরে সরাসরি কাঁচা গোবর ব্যবহার করা যাবে না): ৫,০০০ - ৬,০০০ কেজি/হেক্টর
- শুকনো পোল্ট্রি লিটার: ২,০০০ - ৩,০০০ কেজি/হেক্টর

সারের নাম	প্রয়োগের পরিমাণ (শতাংশ/প্রতি শতক)
সরিষার খৈল	৫০–১০০ গ্রাম
চিটাগুড়	১০০ গ্রাম
কুঁড়া	১০০ গ্রাম
ইস্ট পাউডার	১–২ চা-চামচ
কম্পোস্ট সার	৫–৭ কেজি

রাসায়নিক সার (Inorganic Fertilizer):

জৈব সারের পাশাপাশি রাসায়নিক সার দ্রুত পুষ্টি সরবরাহ করে, ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

প্রস্তাবিত মাত্রা (প্রতি হেক্টর):

- ✓ ইউরিয়া: ১০ কেজি
- ✓ সিঙ্গেল সুপার ফসফেট (SSP): ১৫ কেজি

সার প্রয়োগের নিয়ম/পদ্ধতি:

- মাছ মজুদের আগে প্রয়োজনীয় জৈব সার পুকুরে প্রয়োগ করতে হবে, যাতে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপন্ন হয়।
- সরিষার খৈল, চিটাগুড়, অল্প পরিমানে কুঁড়া এবং ইস্ট একসঙ্গে মিশিয়ে ২ -৩ দিন গাঁজিয়ে (Fermentation) তারপর পুকুরে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে।
- গোরুর গোবর প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রথমে গোরুর গোবর রোদে কিছুটা শুকিয়ে তারপর সেই গোবরের তরল মিশ্রণ বানিয়ে পুকুরে প্রয়োগ করতে হবে।
- কম্পোস্ট সার ব্যবহার করলে চুন প্রয়োগের ৩ - ৪ দিন পরে পুকুরে প্রয়োগ করা উচিত।
- অজৈব সার হিসেবে SSP আগে জলে ১২ - ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। এরপর ইউরিয়ার সঙ্গে মিশিয়ে অথবা আলাদাভাবে জলে গুলে সমগ্র পুকুরে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে।
- সার প্রয়োগের সময় পুকুরে পর্যাপ্ত জল থাকতে হবে এবং প্রয়োগের পর জলের রং ও স্বচ্ছতা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- একবারে অতিরিক্ত সার প্রয়োগ না করে প্রয়োজন অনুযায়ী ভাগ করে প্রয়োগ করলে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন দীর্ঘদিন বজায় থাকে।

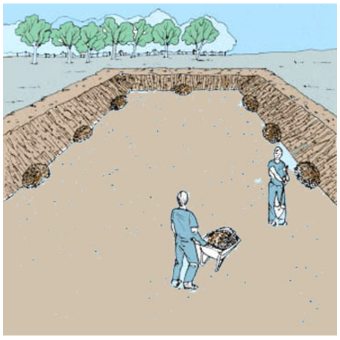

পুকুরে সারের প্রয়োগ
ছবির উৎস: FAO

সুষম সার ব্যবস্থাপনা:

- সুস্থ ও উৎপাদনশীল পুকুরের জন্য জৈব ও রাসায়নিক উভয় ধরনের সার সঠিক অনুপাতে ব্যবহার করা উচিত। এতে দীর্ঘ সময় ধরে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন বজায় থাকে এবং পুকুরের জলের গুণগত মান স্থিতিশীল থাকে।
- নির্ধারিত মাত্রার অতিরিক্ত সার প্রয়োগ করা যাবে না।
- অতিরিক্ত সার প্রয়োগে শ্যাওলার অতিরিক্ত বৃদ্ধি হতে পারে, যা পরে অক্সিজেনের ঘাটতি সৃষ্টি করে মাছের মৃত্যুর কারণ হতে পারে।
- জলের রং, স্বচ্ছতা এবং জলের গুণগত মান নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজন অনুযায়ী সার প্রয়োগ করতে হবে।
- চাষকালীন সময়ে অল্প মাত্রায় নিয়মিত সার প্রয়োগ করলে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন দীর্ঘদিন বজায় থাকে।

সার প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু সতর্কতা:

- সুন্দরবনের অধিকাংশ পুকুর বৃষ্টিনির্ভর হওয়ায় অতিবৃষ্টির পরে পুষ্টি উপাদান জলের সঙ্গে বেরিয়ে যেতে পারে। তাই ভারী বৃষ্টিপাতের পর পুকুর পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজন অনুযায়ী সার পুনরায় প্রয়োগ করতে হবে।
- জোয়ার-ভাটা বা লবণাক্ত জলে প্রভাবিত এলাকায় সার প্রয়োগের আগে পুকুরের লবণাক্ততা ও pH পরীক্ষা করতে হবে।
- মেঘলা বা বৃষ্টির দিনে পুকুরে সার প্রয়োগ করা যাবে না।
- জৈব সার অবশ্যই ভালোভাবে পচানো হতে হবে; কাঁচা গোবর বা তাজা পোল্ট্রি লিটার ব্যবহার করলে পুকুরের জলের গুণগত মান নষ্ট হতে পারে এবং অ্যামোনিয়া বৃদ্ধি পেতে পারে।
- তাই সবসময় অল্প অল্প করে নিয়মিত সার প্রয়োগ করতে হবে; একবারে অতিরিক্ত সার প্রয়োগ করা যাবে না।

পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য (প্ল্যাঙ্কটন) পরীক্ষা:

মাছের ভালো বৃদ্ধি ও অধিক উৎপাদনের জন্য পুকুরে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য (ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন ও জুপ্ল্যাঙ্কটন) থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত সার প্রয়োগের ৫ – ১০ দিন পর পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হতে শুরু করে। তাই মাছ মজুদের আগে পুকুরে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হয়েছে কিনা তা অবশ্যই পরীক্ষা করা উচিত।

প্রাকৃতিক খাদ্য শনাক্ত করার উপায়

১. পুকুরের জলের রং পর্যবেক্ষণ:

- পুকুরের জল যদি হালকা সবুজ অথবা হালকা ধূসর-বাদামী রঙের হয়, তবে বুঝতে হবে পুকুরে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্ল্যাঙ্কটন উৎপন্ন হয়েছে।
- আর পুকুরের জল যদি একেবারে স্বচ্ছ বা গাঢ় সবুজ হয়, তবে পুকুরের জলের গুণগত মান পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

পুকুরের জলের রং পর্যবেক্ষণ
ছবির উৎস: Anit Mondal

২. হাত ডুবিয়ে পরীক্ষা (ঘরোয়া পদ্ধতি):

- দুপুরের দিকে সূর্যের আলোয় পুকুরের জলে কনুই পর্যন্ত হাত ডুবিয়ে হাতের তালু লক্ষ্য করলে যদি হাতের তালু অস্পষ্ট বা ঝাপসা দেখা গেলে বুঝতে হবে পুকুরে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য রয়েছে।
- আর যদি হাতের তালু পরিষ্কার দেখা গেলে বুঝতে হবে প্রাকৃতিক খাদ্যের পরিমাণ কম, তাই প্রয়োজন অনুযায়ী সার প্রয়োগ করতে হবে।
- ঘোলা জলে এই পরীক্ষা করলে সঠিক ফল পাওয়া যায় না।

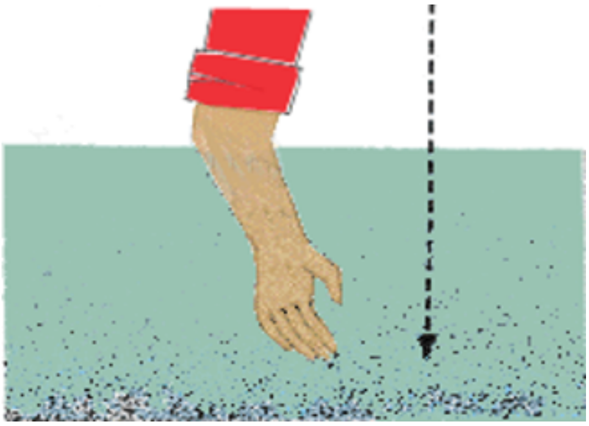

পুকুরে হাত ডুবিয়ে খাদ্য পরীক্ষা
ছবির উৎস: FAO

৩. সেচি ডিস্ক (Secchi Disc) দ্বারা পরীক্ষা:

- বৈজ্ঞানিকভাবে পুকুরে প্ল্যাংকটনের পরিমাণ তথা পুকুরের দৃশ্যতা পরিমাপের জন্য সেচি ডিস্ক ব্যবহার করতে হবে।
- একটি আদর্শ মাছচাষের পুকুরে সেচি ডিস্কের দৃশ্যমানতা ৪০ – ৬০ সেন্টিমিটার হলে তা প্রাকৃতিক খাদ্যের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত করা হয়ে থাকে।
- দৃশ্যমানতা ৪০ সেমি এর কম হলে অতিরিক্ত প্ল্যাংকটন এবং ৬০ সেমি–এর বেশি হলে প্রাকৃতিক খাদ্যের ঘাটতি আছে তা বুঝতে হবে।

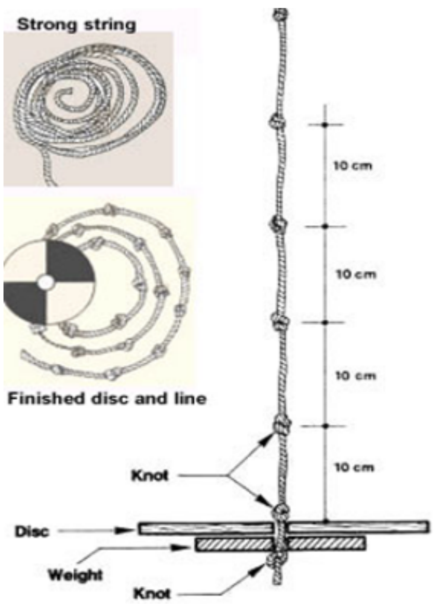

সেচি ডিস্ক দ্বারা খাদ্য পরীক্ষা
ছবির উৎস: FAO

৪. গ্লাস পদ্ধতিতে পরীক্ষা:

- একটি স্বচ্ছ কাঁচের গ্লাস বা বোতলে পুকুরের বিভিন্ন স্থান (প্রায় ২ ফুট গভীরতা থেকে) থেকে জল সংগ্রহ করতে হবে।
- এরপর গ্লাসটিকে সূর্যের আলোয় ধরে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- জলে সবুজাভ বা হালকা বাদামী সূক্ষ্ম কণিকা ভাসতে দেখা গেলে বুঝতে হবে পুকুরে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য (প্ল্যাঙ্কটন) রয়েছে।
- আর জল যদি সম্পূর্ণ স্বচ্ছ দেখায়, তবে বুঝতে হবে প্রাকৃতিক খাদ্যের পরিমাণ কম রয়েছে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সার প্রয়োগ করতে হবে।
- মনে রাখবেন ঘোলা জলে প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা করলে সঠিক ফল পাওয়া যায় না।

এছাড়াও পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য কতটা পরিমান হয়েছে তা প্ল্যাঙ্কটন নেট এর সাহায্যে পরীক্ষা করা যেতে পারে।

প্ল্যাঙ্কটন নেটের সাহায্যে খাদ্য পরীক্ষা
ছবির উৎস: Anit Mondal

জৈব নিরাপত্তা (Biosecurity) কী?

জৈব নিরাপত্তা (Biosecurity) হলো এমন কিছু প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে মাছের পুকুরে রোগজীবাণু, পরজীবী এবং ক্ষতিকর জীবের প্রবেশ, বিস্তার ও সংক্রমণ প্রতিরোধ করা হয়। সহজভাবে বলতে গেলে, **"রোগ হওয়ার পর চিকিৎসা করার চেয়ে রোগ প্রতিরোধ করাই হলো জৈব নিরাপত্তার মূল লক্ষ্য।"**

জৈব নিরাপত্তা কেন গুরুত্বপূর্ণ?

সুস্থ পুকুরই সফল মাছচাষের ভিত্তি। একবার পুকুরে রোগ ছড়িয়ে পড়লে মাছের মৃত্যুহার বেড়ে যায়, উৎপাদন কমে যায় এবং চাষিকে বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। তাই মাছ মজুদের শুরু থেকেই জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করলে রোগের ঝুঁকি অনেকাংশে কমানো যায় এবং মাছের উৎপাদন ভালো হয়।

জৈব নিরাপত্তার উপকারিতা

- মাছকে বিভিন্ন রোগ ও পরজীবীর আক্রমণ থেকে সুরক্ষা করে।
- মাছের মৃত্যুহার কমায় এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করে।
- ওষুধ ও রাসায়নিক ব্যবহারের প্রয়োজন কমায়, ফলে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়।
- জলের গুণগত মান বজায় রাখতে সাহায্য করে।
- মাছের বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা উন্নত করে।
- চাষির আর্থিক ক্ষতি কমিয়ে লাভজনক, পরিবেশবান্ধব ও টেকসই মাছচাষ নিশ্চিত করে।

মাছচাষে অনুসরণীয় জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থা:

- সর্বদা সুস্থ ও রোগমুক্ত পোনা নির্ভরযোগ্য জায়গা থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- মাছ মজুদের আগে পুকুর পরিষ্কার, চুন প্রয়োগ এবং প্রয়োজনে জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
- নতুন পোনা সরাসরি পুকুরে না ছেড়ে কিছু সময় পর্যবেক্ষণে (Quarantine) রাখলে ভালো হয়।
- নির্দিষ্ট দিনের ব্যাবধানে জলের গুণগত মান (pH, দ্রবীভূত অক্সিজেন, তাপমাত্রা ইত্যাদি) পরীক্ষা করতে হবে।
- অতিরিক্ত খাদ্য প্রয়োগ করা যাবে না এবং পুকুরে জৈব বর্জ্য জমতে দেওয়া যাবে না।

- জাল, বালতি, পাত্র ও অন্যান্য মাছচাষের অন্যান্য সরঞ্জাম পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট এর সাহায্যে পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করে ব্যবহার করতে হবে।
- অসুস্থ বা মৃত মাছ দ্রুত পুকুর থেকে তুলে নিয়ে নিরাপদ স্থানে মাটি চাপা দিতে হবে। পুকুরে অবশ্যই অবাধে বন্য মাছ, ব্যাঙ, কাঁকড়া বা অন্যান্য অবাঞ্ছিত প্রাণীর প্রবেশ পুকুরের চারিপাশে জাল দিয়ে ঘিরে বন্ধ করতে হবে।
- নিয়মিত পুকুর পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং মাছের অস্বাভাবিক আচরণ দেখা দিলে দ্রুত মৎস্য বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে।

পুকুরের জৈবনিরাপত্তার ব্যবস্থাসমূহ
ছবির উৎস: Anit Mondal (a) & Ms. Gunjan Karnatak (b), ICAR-CIFRI

পুকুরের বাঁধের স্থায়িত্ব ও বন্যা থেকে সুরক্ষা:

সুন্দরবন অঞ্চলের অধিকাংশ পুকুর বৃষ্টিনির্ভর এবং বর্ষাকালে অতিবৃষ্টি, জোয়ার-ভাটা, ঘূর্ণিঝড় ও আকস্মিক বন্যার প্রভাবের কারণে বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে। তাই SIS – কার্প সম্মিলিত মাছচাষের সফলতা অনেকাংশে পুকুরের বাঁধের দৃঢ়তা, উচ্চতা এবং নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের ওপর নির্ভর করে। একটি শক্ত ও সুরক্ষিত পুকুরের পাড় শুধু জল ধরে রাখে না, বরং মাছ ভেসে যাওয়া, পুকুরে নোনা জলের প্রবেশ এবং আর্থিক ক্ষতি থেকেও চাষিকে রক্ষা করে।

একটি আদর্শ পুকুরের বাঁধ এমনভাবে নির্মাণ করতে হবে যাতে ৫ – ৭ ফুট জলের চাপ সহজে সহ্য করতে পারে এবং কোথাও জল চুইয়ে না যায় বা বাঁধ সহজে ধসে না পড়ে। এজন্য বাঁধের ভীত প্রশস্ত, মজবুত হতে হবে। পুকুরের বাঁধ নির্মাণের সময় মাটি ভালোভাবে চাপ দিয়ে বসাতে হবে এবং সম্ভব হলে এঁটেল মাটি ব্যবহার করতে পারলে ভালো হয়। এতে জল চুইয়ে বের হওয়া কমে এবং বাঁধ দীর্ঘদিন স্থায়ী থাকে। সুন্দরবনের মতো বন্যাপ্রবণ এলাকায় বর্ষাকালে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত ও জলোচ্ছ্বাসের ঝুঁকি বিবেচনা করে বাঁধের ওপরের অংশ উঁচু রাখতে হবে।

যেসব পুকুর নদী, খাঁড়ি বা জোয়ার-ভাটার প্রভাবিত এলাকার কাছাকাছি অবস্থিত, সেখানে বাঁধের ওপর মজবুত নাইলনের জাল বা নেট ফেন্সিং স্থাপন করতে পারলে খুবই ভালো হয়। এটি অতিবৃষ্টি, জলোচ্ছ্বাস বা আকস্মিক বন্যার সময় মাছ পুকুর থেকে বেরিয়ে যাওয়া প্রতিরোধ করতে পারবে। প্রয়োজনে জলের প্রবেশ ও নিষ্কাশনের মুখে (Inlet ও Outlet) সূক্ষ্ম জালে বেঁধে দিতে হবে এর ফলে বাইরের অবাঞ্ছিত মাছ ও শিকারি প্রাণীর প্রবেশও বন্ধ করা যায়।

সুন্দরবনের চাষী ভাইদের জন্যে বিশেষ কিছু পরামর্শ:

- বর্ষা শুরুর আগে এবং ঘূর্ণিঝড়ের আগে বাঁধ ভালোভাবে দেখে নিতে হবে এবং পুকুরের বাঁধে কোনো ফাটল, ইঁদুরের গর্ত বা ক্ষয় দেখা দিলে দ্রুত মেরামত করতে হবে।
- পুকুরের বাঁধে ঘাস লাগিয়ে ক্ষয় রোধ করা যায় এবং বড় গাছ জন্মাতে দেওয়া যাবে না।
- প্রবল বৃষ্টি বা বন্যার পূর্বাভাস থাকলে বাঁধের দুর্বল অংশে বালির বস্তা বা অতিরিক্ত মাটি দিয়ে অস্থায়ীভাবে শক্তিশালী করে দিতে হবে।
- জাল, স্লুইস গেটে জলের প্রবেশ-নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নিয়মিত পরীক্ষা করে রাখলে পরবর্তীতে সুবিধে হয়।

পুকুরে মাছ মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা:

পুকুর প্রস্তুতির পর সঠিক পদ্ধতিতে সুস্থ ও উন্নতমানের মাছেরপোনা মজুদ করা মাছচাষের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। পোনার গুণমান, পরিবহন, মজুদের সময় এবং সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করলে মাছের মৃত্যুহার কমে, বৃদ্ধি দ্রুত হয় এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। তাই মাছের মজুদের সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিশেষভাবে অনুসরণ করা উচিত।

প্রজাতি নির্বাচন:

- ✓ স্থানীয় পরিবেশ ও পুকুরের ধরন অনুযায়ী উপযুক্ত কার্প ও ছোট দেশীয় মাছের প্রজাতি নির্বাচন করতে হবে।
- ✓ ঠিক তেমন ভাবে মাছের খাদ্যাভ্যাস ও বাসস্থান অনুযায়ী মাছের প্রজাতি নির্বাচন করতে হবে, যাতে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা কম হয়।
- ✓ সুন্দরবনের জন্য রোগ ও অল্প লবণতা সহনশীল, দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং স্থানীয় বাজারে চাহিদাসম্পন্ন মাছের প্রজাতির নির্বাচন করতে।

উন্নতমানের মাছের চারার নির্বাচন:

মাছের ভালো উৎপাদনের জন্য সুস্থ ও উচ্চ-মানসম্পন্ন মাছের চারার নির্বাচন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ভালো মানের মাছের চারা চেনার উপায়:

- ✓ মাছের চারার দেহ উজ্জ্বল, চকচকে ও পিচ্ছিল হবে।
- ✓ দেহে কোনো ক্ষত, লাল দাগ, ঘা বা বিকৃতি থাকবে না।
- ✓ মাছের চারা দ্রুত সাঁতার কাটবে এবং সক্রিয় থাকবে।
- ✓ জলের স্রোতের বিপরীতে স্বাভাবিকভাবে চলতে পারলে বুঝতে হবে মাছের চারা সুস্থ।
- ✓ একটি বালতি বা হাঁড়িতে জল দিয়ে তাকে হাত দিয়ে ঘুরিয়ে কৃত্রিম স্রোত তৈরি করে মাছের চারা ওই হাঁড়ি বা বালতিতে ছাড়লে যদি স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটে, তবে তা বুঝতে হবে তা ভালো মানের মাছের চারা
- ✓ মাছের চারা লেজের দিকে আলতোভাবে চেপে ধরে রাখলে যদি দ্রুত মাথা ও শরীর নাড়িয়ে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, তবে বুঝতে হবে তা সুস্থ ও শক্তিশালী পোনা।
- ✓ সব পোনা আকারে প্রায় সমান হলে পরবর্তী বৃদ্ধি সমান হয় এবং বড় পোনার দ্বারা ছোট পোনা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

মাছের চারা মজুদের হার:

একটি পুকুরে মোট ৮,০০০ – ১২,০০০টি বড়ো চারা পোনা/হেক্টর (পুকুরের উর্বরতা ও ব্যবস্থাপনার ওপর নির্ভরশীল) ছাড়া যেতে পারে।

প্রজাতি অনুযায়ী কার্পের অনুপাত (উদাহরণ):

- কাতলা – ১৫ – ৩০%
- রুই – ৩০ – ৩৫%
- মৃগেল – ২০ – ২৫%
- গ্রাস কার্প – ৫ – ১০%
- এছাড়াও ছোট দেশীয় মাছ (SIS) যেমন: মৌরালা, চেলা, ট্যাংরা, স্বরপুঁটি এই প্রজাতির মাছ হেক্টর প্রতি ১৫০০০ – ২৫০০০ অনুপাতে পুকুরে মজুদ করা যেতে পারে।
- কার্প ও SIS এর মধ্যে খাদ্য ও বাসস্থান প্রতিযোগিতা কম রাখতে উপযুক্ত প্রজাতি নির্বাচন করতে হবে।

জলের বিষাক্ততা পরীক্ষা:

- পেস্টিসাইট প্রয়োগের পর ১০ – ১৫ দিন অপেক্ষা করতে হবে।
- এরপর কয়েকটি মাছ একটি ছোট জাল খাঁচায় রেখে ওই পুকুরে ২৪ ঘন্টা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- মাছ স্বাভাবিক থাকলে তবেই মাছের পোনা মজুদ করা যাবে।

মাছের চারা সংগ্রহ ও পরিবহন:

- ✓ সর্বদা বিশ্বস্ত সরকারি বা অনুমোদিত হ্যাচারি থেকে মাছের চারা সংগ্রহ করতে হবে।
- ✓ পরিবহনের সময় পর্যাপ্ত অক্সিজেনযুক্ত প্যাকেট বা ট্যাংক ব্যবহার করতে হবে।
- ✓ দীর্ঘ দূরত্বে পরিবহনের ক্ষেত্রে ভোর বা সন্ধ্যার ঠান্ডা সময় বেছে নিলে ভালো হয়।
- ✓ পরিবহনের সময় অপ্রয়োজনীয় ঝাঁকুনি ও অতিরিক্ত ভিড় এড়িয়ে চলতে হবে।

মাছের চারা মজুদের পদ্ধতি:

- ✓ মাছের চারা সকাল বা বিকেলের ঠান্ডা সময়ে পুকুরে ছাড়তে হবে।
- ✓ পরিবহন ব্যাগ বা পাত্রটি ১৫ – ২০ মিনিট পুকুরের জলে ভাসিয়ে রাখতে হবে, যাতে ব্যাগের জল ও পুকুরের জলের তাপমাত্রা সমান হয়ে যায়।

- ✓ এরপর মাছের চারা গুলিকে ওই পুকুরের ১০ লিটার জলে ১ গ্রাম পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট মিশিয়ে অর্থাৎ ১০০ ppm এর দ্রবণ তৈরী করে ওই দ্রবণে মাছের চারা গুলিকে ১ থেকে ২ মিনিট ডুবিয়ে রেখে শোধন করতে হবে।
- ✓ এরপর ধীরে ধীরে অল্প অল্প করে পুকুরের জল মিশিয়ে মাছ গুলিকে পুকুরে ছেড়ে দিতে হবে।
- ✓ ব্যাগের থেকে জল সমেত মাছের চারা সরাসরি পুকুরে ঢালা যাবে না।

মাছের চারা মজুদ
ছবির উৎস: Ms. Gunjan Karnatak, ICAR-CIFRI

মাছের চারা মজুদের পর পর্যবেক্ষণ:

- ✓ মাছের চারা ছাড়ার পর ২ দিন থেকে পুকুরে মাছের খাবার প্রয়োগ করা যেতে পার এবং প্রথম ২ – ৩ দিন নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- ✓ কোনো মৃত বা দুর্বল পোনা দেখা গেলে দ্রুত পুকুরের থেকে তুলে ফেলতে হবে।
- ✓ প্রথম কয়েকদিন অতিরিক্ত খাদ্য প্রয়োগ করা যাবে না।

পুকুরে মাছের চারা মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা:

মাছের খাদ্য ব্যবস্থাপনা:

মাছের সুস্থ বৃদ্ধি, অধিক উৎপাদন এবং লাভজনক মাছচাষের জন্য সঠিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি পুকুরের প্রাকৃতিক খাদ্য (প্ল্যাঙ্কটন, জলজ উদ্ভিদ, ক্ষুদ্র জলজ প্রাণী ও জৈব পদার্থ) মাছের পুষ্টির একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে কাজ করে। তবে নিবিড় বা আধা-নিবিড় মাছচাষে শুধু প্রাকৃতিক খাদ্য মাছের সম্পূর্ণ পুষ্টি চাহিদা পূরণ করতে পারে না। তাই মাছের দ্রুত বৃদ্ধি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অধিক উৎপাদনের জন্য পরিপূরক খাদ্য নিয়মিত সরবরাহ করা প্রয়োজন।

সাধারণভাবে মাছচাষে মোট উৎপাদন ব্যয়ের প্রায় ৬০ - ৭০% খাদ্য বাবদ খরচ হয়ে থাকে। তাই সঠিক খাদ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খাদ্যের অপচয় কমিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং লাভজনক মাছচাষ নিশ্চিত করা সম্ভব।

মাছের খাদ্যের প্রকারভেদ:

মাছের খাদ্য প্রধানত দুই প্রকারের হয়ে থাকে, যথা:

১. প্রাকৃতিক খাদ্য:

পুকুরে স্বাভাবিকভাবে উৎপন্ন বিভিন্ন জীব মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন – ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন (উদ্ভিদকণা), জুপ্ল্যাঙ্কটন (প্রাণীকণা), ক্ষুদ্র জলজ কীটপতঙ্গ, জলজ উদ্ভিদ, গেঁড়ি, গুগলি ও অন্যান্য ক্ষুদ্র জলজ প্রাণী, পচনশীল জৈব পদার্থ।

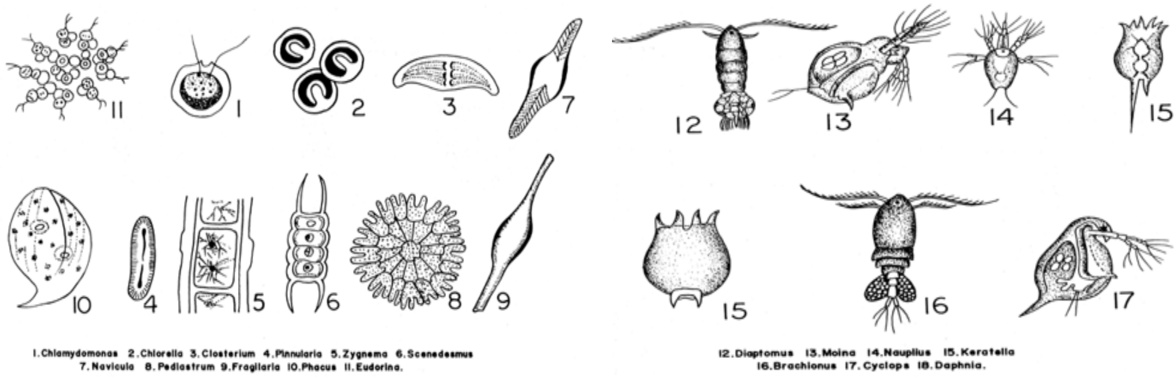

পুকুরে উপলব্ধ মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য (উদ্ভিদ ও প্রাণী কণা)
ছবির উৎস: FAO

আপনার পুকুরে পর্যাপ্ত মাছের প্রাকৃতিক খাবার আছে কিনা তা বোঝার উপায়:

- পুকুরের জলের রং হালকা সবুজ অথবা হালকা ধূসর-বাদামী হলে বুঝতে হবে পর্যাপ্ত প্ল্যাঙ্কটন অর্থাৎ পুকুরে মাছের খাবার পর্যাপ্ত পরিমানে রয়েছে।
- সেচি ডিস্ক (Secchi Disc) দ্বারা পুকুরের জলের স্বচ্ছতা ৪০ - ৬০ সেমি হলে বুঝতে হবে পুকুরের মাছের জন্যে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্যে রয়েছে।
- ঘরোয়া পরীক্ষায় কনুই পর্যন্ত হাত পুকুরের জলে ডুবিয়ে হাতের তালু অস্পষ্ট দেখা গেলে বুঝতে হবে প্রাকৃতিক খাদ্য পর্যাপ্ত রয়েছে।
- এছাড়াও, স্বচ্ছ কাঁচের গ্লাসে পুকুরের জল নিয়ে সূর্যের আলোয় দেখলে যদি সবুজাভ ক্ষুদ্র কণা দেখা যায়, তবে পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য ভালো রয়েছে।

সেচি ডিস্ক (Secchi Disc) ব্যবহার করে বৈজ্ঞানিকভাবে পুকুরের জলের স্বচ্ছতা পরিমাপ করা হয়। কালো-সাদা রঙের এই চাকতিটি ধীরে ধীরে জলে নামিয়ে যে গভীরতায় তা দৃষ্টির বাইরে চলে যায় সেই গভীরতাকে সেচি ডিস্কের পাঠ (Secchi depth) বলা হয়। এই মান থেকেই পুকুরে প্ল্যাঙ্কটনের প্রাচুর্যতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

সেচি ডিস্কের দৃশ্যমানতা	ফলাফল
৪০ সেমি-এর কম	প্ল্যাঙ্কটনের পরিমাণ অতিরিক্ত; রাতে দ্রবীভূত অক্সিজেন কমে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে।
৪০-৬০ সেমি	মাছচাষের জন্য আদর্শ; প্রাকৃতিক খাদ্যের পরিমাণ পর্যাপ্ত।
৬০ সেমি-এর বেশি	প্ল্যাঙ্কটনের পরিমাণ কম; প্রয়োজনে চুন ও সার প্রয়োগ করে প্রাকৃতিক খাদ্য বৃদ্ধি করতে হবে।

২. পরিপূরক খাদ্য (Supplementary Feed):

যদি পুকুরে যথেষ্ট পরিমানে প্রাকৃতিক খাদ্য না থাকে, তখন মাছের খাদ্যের চাহিদা পূরণের এবং মাছের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য প্রতিদিন পরিপূরক খাদ্য একটি নির্দিষ্ট পরিমানে পুকুরে দেওয়া হয়। এই খাদ্য তৈরির জন্যে খুবই সাবধানে কয়েকটি নির্দিষ্ট উপাদানকে নির্বাচন করা হয়ে থাকে, যা মাছের দ্রুত বৃদ্ধির সহায়তা করে।

পরিপূরক খাদ্য তৈরির কয়েকটি উপাদান, যা স্থানীয়ভাবে উপলব্ধ, যেমন –

সরিষার খৈল, সয়াবিন খৈল, চালের কুঁড়া, গমের ভূষি, ভুট্টার গুঁড়ো, বাদামের খৈল, ফিশ মিল, চিংড়ির গুঁড়ো ইত্যাদি উপাদান ব্যবহার করে প্রস্তুত করা যায়। এছাড়াও, বাজারে মাছের জন্য ভাসমান (Floating Feed) ও ডুবন্ত (Sinking Feed) – উভয় ধরনের পরিপূরক খাদ্য সহজলভ্য।

স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত খাদ্য উপাদানের গুণমান:

ক্রমিক নং	উপকরণ	প্রোটিন (%)	চর্বি (%)	ফাইবার (%)	শর্করা (%)
১	ধানের তুষি (তৈলবিহীন)	১৮.৮১	০.৬৪	১৪.৮৩	৪৭.৭৬
২	গমের ভূষি	১৪.৪৪	১.৩৮	১০.৬২	৫৬.২৫
৩	বাদামের খোল	৩৬.৬৯	৮.৪	১৯.৬৮	১৮.৯৭
৪	সরিষার খোল	৩১.৫	৮.৭৯	১৩.১	২৯.০১
৫	কালো মুগ ডালের ভুষি	১২.৩৮	১.২	১৮.৩১	৪৩.১৮
৬	সয়াবিনের খোল	৪৪.৪১	১.৭৫	৯.১৪	৩২.২২
৭	শুকনো মাছের গুঁড়ো	৫৪.৬১	১২.৮৯	–	১১.২২

২৫% প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্য প্রস্তুতির উপাদান সমূহ:

উপকরণ	পরিমাণ (কেজি)
শুকনো মাছের গুঁড়ো	৫
সয়াবিনের খোল	১০
সরিষার খোল	৩৯
ভুট্টার ভুসি / গমের ভুসি / ধানের ভুসি	৪৪
ভিটামিন-খনিজ দ্রব্যের মিশ্রণ	২

ঘরে তৈরি মাছের পরিপূরক খাদ্য প্রস্তুতের ধাপসমূহ:

- নির্ধারিত খাদ্য উপকরণ গুলিকে নির্দিষ্ট পরিমান অনুযায়ী সকল উপকরণ সংগ্রহ করে পরিষ্কার ও শুকনো করে ফেলতে হবে।
- এরপর সব উপকরণ গুলিকে গুঁড়ো করে চালুনি দিয়ে চেলে নিতে হবে।
- এরপর প্রতিটি নির্ধারিত উপকরণ গুলিকে সঠিকভাবে ওজন করে সব উপাদান গুলিকে মিশিয়ে নিতে হবে।
- এরপর মিশ্রণের সঙ্গে ভিটামিন ও খনিজ প্রিমিক্স যোগ করে মিশিয়ে নিতে হবে।
- এরপর ধীরে ধীরে পরিমাণমতো পরিষ্কার হালকা গরম জল দিয়ে মণ্ড (dough) তৈরি করে নিতে হবে।
- তারপর প্রস্তুত মণ্ড থেকে হাতে বা পিলেট মেশিনের সাহায্যে মাছের উপযোগী আকারের দানা (pellet) তৈরি করে দানাগুলো রোদে বা ছায়াযুক্ত বায়ু চলাচলকারী স্থানে সম্পূর্ণ শুকিয়ে নিতে হবে।
- শুকিয়ে গেলে খাদ্য আর্দ্রতামুক্ত, বায়ুরোধী পাত্র বা প্যাকেটে সংরক্ষণ করতে হবে।
- এরপর সংরক্ষিত খাদ্য প্রয়োজন অনুযায়ী মাছের আকার ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত পরিমাণে ব্যবহার করা যেতে পারে।

পরিপূরক খাদ্য প্রস্তুতের ধাপসমূহ
ছবির উৎস: FAO

পরিপূরক খাদ্যে প্রয়োগের উদ্দেশ্য:

- মাছের দ্রুত বৃদ্ধি নিশ্চিত করা।
- উৎপাদন বৃদ্ধি করা।
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- খাদ্য রুপান্তর দক্ষতা (Feed Conversion Efficiency) উন্নত করা।

ভালো খাদ্যের বৈশিষ্ট্য:

একটি আদর্শ মাছের খাদ্যে থাকতে হবে –

১) পর্যাপ্ত প্রোটিন
২) শক্তির উৎস (শর্করা ও চর্বি)
৩) ভিটামিন
৪) খনিজ পদার্থ
৫) প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিড

সাধারণভাবে মাছ চাষে, কার্প ও SIS মাছের জন্য ২৫ – ৩০% প্রোটিনযুক্ত খাদ্য যথেষ্ট। উচ্চ প্রোটিন (৩৫-৪০%) মূলত পোনা ও প্রাথমিক বৃদ্ধির পর্যায়ে অধিক উপযোগী।

খাদ্য প্রয়োগের পরিমাণ:
প্রতিদিন মাছের মোট ওজনের ভিত্তিতে খাদ্য দিতে হবে।

মাছের বৃদ্ধি পর্যায়	দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ
ছোট পোনা	দেহের ওজনের ৮–১০%
আঙুল পোনা (Fingerling)	৫–৬%
বাড়ন্ত মাছ	৩–৪%
বড় মাছ	২–৩%

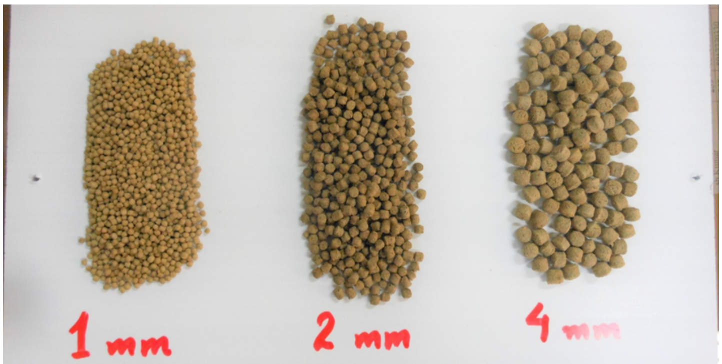

বিভিন্ন আকৃতির মাছের খাবার
ছবির উৎস: Ms. Gunjan Karnatak, ICAR-CIFRI

- খাদ্য প্রয়োগের পদ্ধতি বিভিন্ন পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে, যেমন মাছের প্রজাতি, বয়স, পুকুরের ধরন ও প্রাকৃতিক খাদ্যের উপলব্ধতা ইত্যাদি।
- মাছের সঠিক বৃদ্ধির জন্য শুধু ভালো মানের খাদ্য দিলেই হয় না, তা সঠিকভাবে প্রয়োগ করা ও তার ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- সাধারণত মাছ চাষের ক্ষেত্রে মূলত ৩ টি পদ্ধতিতে খাদ্যের প্রয়োগ করা হয়ে থাকে যেমন:

  ১) ছড়ানো বা ব্রডকাস্টিং পদ্ধতি

  ২) ব্যাগ অথবা বস্তার মাধ্যমে খাদ্য খাওয়ানোর পদ্ধতি

  ৩) ট্রে এর মাধ্যমে খাদ্য খাওয়ানোর পদ্ধতি

- নিয়মিত মাছের খাদ্য গ্রহণ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মাছের খাদ্যের অপচয় হ্রাস করা যায় এবংমাছের সঠিক খাদ্যের চাহিদা নিশ্চিত করা যায়।

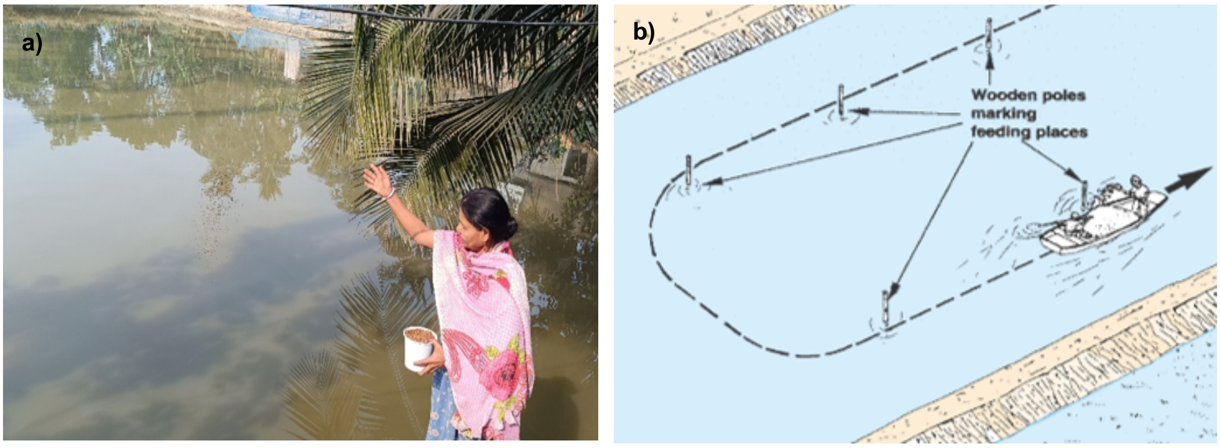

মাছ চাষের পুকুরে ছড়ানো (a) ও ব্যাগ (b) পদ্ধতিতে খাবার প্রদান
ছবির উৎস: Anit Mondal (a) & FAO (b)

খাদ্য প্রয়োগের সময়:

- ✓ মাছের স্বাস্থ্য, বৃদ্ধি এবং খাদ্যের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে সঠিক সময়ে খাদ্য প্রয়োগ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- ✓ সাধারণত সকাল ৮টা থেকে ১০টা এবং বিকেল ৪টা থেকে ৫টার মধ্যে মাছ সবচেয়ে বেশি সক্রিয় থাকে এবং খাদ্য গ্রহণে আগ্রহ দেখায়, ফলে এ সময়টি খাদ্য প্রদানের জন্য উপযুক্ত।
- ✓ মধ্য দুপুর কিংবা গভীর রাতে খাদ্য না দেওয়াই ভালো কারণ এই সময় জলের তাপমাত্রা অস্বাভাবিক হয়ে যায় এবং অক্সিজেনের পরিমাণ কম থাকে, ফলে মাছ খাদ্য গ্রহণে অনীহা দেখায়।

খাদ্য রূপান্তর দক্ষতা বা Feed Conversion Ratio:

- FCR বা Feed Conversion Ratio হলো একটি পরিমাপক পদ্ধতি, যার মাধ্যমে বোঝা যায়, এক কেজি মাছ উৎপাদন করতে কত কেজি খাদ্য খরচ হয়েছে।

$$\text{FCR} = \frac{\text{মাছের মোট গৃহীত খাদ্য (কেজি)}}{\text{মাছের মোট ওজন বৃদ্ধি (কেজি)}}$$

এর গুরুত্ব:

- কম FCR মানে মাছের খাদ্য ভালোভাবে ব্যাবহৃত হচ্ছে মাছের দেহে (অর্থাৎ, খাদ্যের অপচয় কম)।
- বেশি FCR মানে মাছের খাদ্য ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি রয়েছে অর্থাৎ খাদ্যের অপচয় হচ্ছে।

খাদ্যের অপব্যবহার বা ঘাটতি পর্যবেক্ষণ:

- মাছের বৃদ্ধি ও খাদ্যের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে নিয়মিত মাছের খাদ্য গ্রহণের আচরণ পর্যবেক্ষণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- নির্ধারিত সময়ে খাদ্য দেওয়ার পর যদি অল্প সংখ্যক মাছ খাদ্য গ্রহণ করতে আসে, তবে বুঝতে হবে মাছ অসুস্থ, জলের গুণগত মান খারাপ অথবা খাদ্যের গুণগত মানে সমস্যা রয়েছে।
- খাদ্য দেওয়ার পর মাছ স্বাভাবিকভাবে দ্রুত খাদ্য গ্রহণ করলে বুঝতে হবে মাছ সুস্থ এবং খাদ্যের পরিমাণ ও গুণগত মান ঠিক আছে।
- নির্ধারিত সময়ের পরও যদি খাদ্য জলে অবশিষ্ট থাকে, তবে বুঝতে হবে অতিরিক্ত খাদ্য প্রদান করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে পরের দিন খাদ্যের পরিমাণ কমাতে হবে।
- মাছ যদি দীর্ঘদিন ধীরে বৃদ্ধি পায়, দেহ রোগা বা দুর্বল দেখায় এবং মাথা তুলনামূলক বড় মনে হয়, তবে তা অপুষ্টি বা অপর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহের লক্ষণ হতে পারে।
- খাদ্যে পর্যাপ্ত প্রোটিন, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান না থাকলে মাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় এবং দেহ ও লেজ ক্রমশ ক্ষীণ বা শুকিয়ে যেতে পারে।
- প্রতি ১৫ দিন অন্তর কিছু মাছে ধরে গড় ওজন নিয়ে সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ ঠিক করা উচিত।

কখন খাদ্য প্রদান বন্ধ বা কমিয়ে দিতে হবে?

- দ্রবীভূত অক্সিজেন কম থাকলে
- ভারী বৃষ্টির সময়
- অতিরিক্ত গরম বা শীতের সময়
- পুকুরে সার প্রয়োগের দিন
- মাছ অসুস্থ থাকলে
- মাছ খাদ্য গ্রহণে অনীহা দেখালে

খাদ্য রক্ষণাবেক্ষণ:

- খাদ্য শুষ্ক, ঠান্ডা ও বদ্ধ পরিষ্কার জায়গায় রাখতে হবে এবং খাদ্য যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে ও লক্ষ্য রাখতে হবে এবং খোলা খাবারে বস্তার মুখ সবসময় বেঁধে রাখতে হবে।
- খাবারের বস্তা যাতে ইঁদুর, পাখি বা কোনোপ্রকার প্রাণী ক্ষতি করতে না পারে তার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে।
- খাবার এর বস্তা গুলিকে মাটি বা ঘরের মেঝে থেকে ২ থেকে ৩ ইঞ্চি উপরে তুলে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।
- একসাথে অনেক বেশি পরিমান খাবারের বস্তা না কিনে প্রয়োজন অনুযায়ী খাবারের বস্তা কিনতে হবে।

খাদ্য সংরক্ষনের পদ্ধতি
ছবির উৎস: FAO

সঠিক খাদ্য ব্যবস্থাপনার উপকারিতা:

- **মাছের স্বাস্থ্য:**
  - ✓ সঠিক ও কার্যকর খাদ্য ব্যবস্থাপনা মাছের দ্রুত বৃদ্ধি নিশ্চিত করে এবং রোগের ঝুঁকি কমায়, যার ফলে মাছের বেঁচে থাকার হার ১০-২০% পর্যন্ত বাড়তে পারে।
- **উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি:**
  - ✓ সঠিকভাবে খাদ্য ব্যবহারের মাধ্যমে মাছের উৎপাদনশীলতা ৫-১৫% পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং মোট উৎপাদন খরচ কমে।
- **পরিবেশগত উপকারিতা:**
  - ✓ সঠিক খাদ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খাদ্যের অপচয় কমে ও জলের গুণমান ভালো থাকে, ফলে পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব কমে।
- **অর্থনৈতিক লাভ:**
  - ✓ সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৎস্য খামারগুলো ৫-১৫% পর্যন্ত বেশি লাভ করতে পারে।

মাছ মজুদের পর সার ব্যবস্থাপনা:

পুকুরে মাছ মজুদ করার আগে প্রাথমিক সার প্রয়োগ করা হলেও, মাছ ছাড়ার পরও নির্দিষ্ট সময় অন্তর সুষমভাবে সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন। এর উদ্দেশ্য হলো পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য (ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন ও জুপ্ল্যাঙ্কটন) এর উৎপাদন বজায় রাখা, যা বিশেষ করে SIS ও কার্প মাছের পোনা এবং বাড়ন্ত মাছের বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সার প্রয়োগের নির্দেশিকা:

- মাছ মজুদের ১০ – ১৫ দিন পরে পুকুরের জলের রং ও স্বচ্ছতা পরীক্ষা করে প্রয়োজন অনুযায়ী সার প্রয়োগ করতে হবে।
- যদি সেচি ডিস্কের দৃশ্যমানতা ৪০ – ৬০ সেমি থাকে অথবা পুকুরের জল হালকা সবুজ রঙের দেখা যায়, তবে বুঝতে হবে প্রাকৃতিক খাদ্য পর্যাপ্ত রয়েছে। এ অবস্থায় অতিরিক্ত সার প্রয়োগের প্রয়োজন নেই।
- যদি দৃশ্যমানতা ৬০ সেমির বেশি হয় বা জল অতিরিক্ত স্বচ্ছ দেখায়, তাহলে বুঝতে হবে পুকুরে প্ল্যাঙ্কটনের পরিমাণ কম। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মাত্রায় জৈব বা অজৈব সার প্রয়োগ করতে হবে।
- একসঙ্গে বেশি পরিমাণে সার প্রয়োগ না করে অল্প অল্প করে নির্দিষ্ট দিনের ব্যাবধানে সার প্রয়োগ করতে হবে। এতে পুকুরের পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে এবং অতিরিক্ত শৈবাল বৃদ্ধির ঝুঁকি কমে যায়।
- সার প্রয়োগের আগে ও পরে পুকুরের জলের রং, স্বচ্ছতা, মাছের খাদ্য গ্রহণ এবং দ্রবীভূত অক্সিজেনের (DO) অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

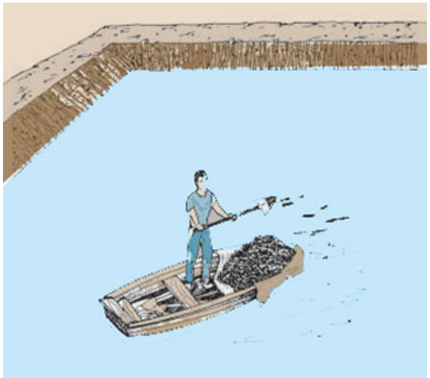

পুকুরে জৈব সারের প্রয়োগ
ছবির উৎস: FAO

পুকুরে অজৈব সারের প্রয়োগ
ছবির উৎস: Anit Mondal

মাছের বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ (Fish Sampling):

মাছের সঠিক বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য এবং খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর মাছের নমুনা (Sampling) পরীক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত প্রতি ১৫ দিনে একবার পুকুর থেকে খেপলা জাল বা ছোট জালের সাহায্যে বিভিন্ন স্থান থেকে অল্প সংখ্যক মাছ ধরে তাদের গড় ওজন ও শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা করলে ভালো হয়। পরিমাপ শেষে মাছগুলোকে দ্রুত ও সতর্কতার সঙ্গে পুনরায় পুকুরে ছেড়ে দিতে হবে, যাতে মাছের ওপর অতিরিক্ত চাপ (Stress) না পড়ে।

মাছের বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ
ছবির উৎস: Anit Mondal

মাছের বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণের উপকারিতা:

- মাছের গড় বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।
- মাছের মোট ওজন (Biomass) নির্ণয় করে সঠিক পরিমাণ খাদ্য প্রদান করা যায়।
- খাদ্যের অপচয় কমে এবং উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়।
- রোগাক্রান্ত বা দুর্বল মাছ সহজে শনাক্ত করা যায়।
- সম্ভাব্য উৎপাদন ও বাজারজাত করার সময় পরিকল্পনা করা সহজ হয়।

পুকুরের তলা ঝাড়া বা পুকুর গোলানো (Bottom Raking):

পুকুরের তলায় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অব্যবহৃত খাদ্য, মাছের মল, পচা জৈব পদার্থ এবং বিষাক্ত গ্যাস জমা হতে পারে, যা মাছের বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। তাই প্রতি ১৫ – ৩০ দিন অন্তর পুকুরের তলা একবার গুলিয়ে দেওয়া উচিত।

- পুষ্টি উপাদান পুনরায় জলের সঙ্গে মিশে প্ল্যাঙ্কটনের উৎপাদনে সহায়তা করে।
- সর্বোপরি, পুকুরের পরিবেশ স্বাস্থ্যকর থাকে এবং মাছের বৃদ্ধি ভালো হয়।

পদ্ধতি:

- লম্বা বাঁশ, ভারী কাঠের গুঁড়ি, লোহার পাইপ অথবা উপযুক্ত ভারী কাটাজাতীয় (Rake) কিছু জিনিস ব্যবহার করে পুকুরের তলা ধীরে ধীরে টেনে গুলিয়ে দিতে হবে।
- এই কাজটি সকালে বা বিকেলে করা উত্তম এবং পুকুর গোলানোর সময় মাছের আচরণ পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

a)

b)

পুকুরের তলা ঝাড়া বা পুকুর গোলানো
ছবির উৎস: Anit Mondal (a) & FAO (b)

উপকারিতা:

- পুকুরের তলায় জমে থাকা অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন সালফাইড, মিথেন ইত্যাদি এর মতো ক্ষতিকর গ্যাস বের হয়ে যায়।
- তলার জৈব পদার্থের পচন দ্রুত হয় এবং পুকুরের তলদেশে অক্সিজেনের প্রবেশের মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

মাছের রোগব্যাধি ও তার প্রতিকার:

মাছের সুস্থ বৃদ্ধি ও অধিক উৎপাদনের জন্য রোগ প্রতিরোধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত জলের গুণগত মানের অবনতি, অতিরিক্ত মাছ মজুত, অপর্যাপ্ত বা অতিরিক্ত খাদ্য প্রদান, জৈব বর্জ্য জমে থাকা এবং দুর্বল জৈব-নিরাপত্তার কারণে মাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। তখন বিভিন্ন ধরনের ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ও পরজীবী জীবাণু সহজেই মাছকে আক্রান্ত করে। তাই **"চিকিৎসার চেয়ে প্রতিরোধই উত্তম"** এই নীতিতে পুকুর ব্যবস্থাপনা করা সবচেয়ে কার্যকর।

মাছের রোগের প্রধান কারণ:

- জলের গুণগত মান খারাপ হওয়া (অক্সিজেন কম, অ্যামোনিয়া বেশি, pH এর পরিবর্তন)
- অতিরিক্ত ঘনত্বে মাছ পুকুরে মজুদ করা
- অতিরিক্ত বা নিম্নমানের খাদ্য প্রয়োগ করা
- পুকুরে পচা জৈব পদার্থ জমে থাকা
- রোগাক্রান্ত পোনা মজুত করা
- হঠাৎ তাপমাত্রা বা লবণাক্ততার পরিবর্তন
- বন্যার সময় বাইরের জল প্রবেশ করে রোগজীবাণু প্রবেশ করা

সুস্থ ও অসুস্থ মাছ চেনার উপায়:

মাছের রোগ দ্রুত শনাক্ত করতে পারলে সময়মতো ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়, ফলে মাছের মৃত্যুহার কমে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। তাই চাষিদের প্রতিদিন মাছের আচরণ ও শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা উচিত।

সুস্থ মাছের লক্ষণ	অসুস্থ মাছের লক্ষণ
• মাছ সক্রিয়ভাবে সাঁতার কাটে এবং স্বাভাবিকভাবে খাদ্য গ্রহণ করে। • মাছের দেহ উজ্জ্বল, চকচকে ও পিচ্ছিল থাকে। • আঁশ, পাখনা ও লেজ অক্ষত ও স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে।	• মাছ অলস হয়ে যায় এবং এক জায়গায় স্থির থাকে। • খাদ্য গ্রহণ কমে যায় বা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। • মাছ বারবার জলের উপরিভাগে উঠে বাতাস গ্রহণের চেষ্টা করে।

• ফুলকার (Gill) রং উজ্জ্বল লাল বা গোলাপি হয়।	• দেহের রং ফ্যাকাশে বা কালচে হয়ে যায় এবং অতিরিক্ত শ্লেষ্মা (Slime) বা লালা দেখা যায়।
• চোখ স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল থাকে। • মাছ স্বাভাবিকভাবে দলে দলে চলাফেরা করে এবং বাইরের উদ্দীপনায় দ্রুত সাড়া দেয়।	• দেহে ক্ষত, লাল দাগ, সাদা দাগ, তুলার মতো আবরণ বা ঘা দেখা দিতে পারে। • পাখনা ও লেজ ক্ষয়প্রাপ্ত বা ছিঁড়ে যেতে পারে। • ফুলকার রং ফ্যাকাশে, বাদামি বা কালচে হয়ে যেতে পারে। • মাছ অস্বাভাবিকভাবে ঘুরতে থাকে, ভারসাম্য হারায় অথবা পুকুরের পাড়, তলদেশ বা অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে শরীর ঘষতে থাকে।

চাষিদের প্রতিদিন যে বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করা উচিত

- মাছ স্বাভাবিকভাবে খাদ্য গ্রহণ করছে কিনা।
- মাছের সাঁতারের আচরণ স্বাভাবিক কিনা।
- মাছের দেহ, পাখনা ও ফুলকায় কোনো ক্ষত বা অস্বাভাবিকতা আছে কিনা।
- জলের রং, স্বচ্ছতা ও দুর্গন্ধ আছে কিনা।
- পুকুরে হঠাৎ মরা মাছ ভেসে উঠছে কিনা।
- জলের উপরিভাগে মাছের অস্বাভাবিক আচরণ বা শ্বাসকষ্টের লক্ষণ অর্থাৎ খাবি খাচ্ছে কিনা দেখতে হবে।

মাছ চাষে সাধারণ রোগ, লক্ষণ ও প্রতিকার:

ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগ:

পাখনা ও লেজ পচা রোগ: এটি একটি মূলত ব্যাকটেরিয়া ঘটিত ছোঁয়াচে রোগ। পুকুরে অত্যধিক হিউমাসযুক্ত কালো পাঁক জমলে এবং পুকুরে সূর্যের আলো কম পৌঁছালে মাছ এই ধরণের রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে।

- **রোগের লক্ষন:**
  - প্রাথমিকভাবে পাখনা ও লেজের কিনারাতে সাদা দাগ দেখা যায়।
  - পাখনা ও লেজের প্রান্তদেশে পচন শুরু হয় এবং পাখনাগুলি খসে পড়তে শুরু করে।
  - আক্রান্ত মাছ অস্বাভাবিক ভাবে পুকুরে ঘুরপাক খেতে থাকে।
  - আক্রান্ত মাছ অস্বাভাবিক ভাবে পুকুরে ঘুরপাক খেতে থাকে।

পাখনা ও লেজ পচা রোগাক্রান্ত মাছ
ছবির উৎস: Dr. Raju Baitha, ICAR-CIFRI

- **প্রতিকার:**

✓ ৩ গ্রাম তুঁতে প্রতি ১ লিটার জলে মিশিয়ে মাছ গুলিকে ৫ মিনিট করে পর পর ৩–৪ দিন ডুবিয়ে রাখতে হবে।

✓ প্রতি লিটার জলে ১ মিলিগ্রাম পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট প্রয়োগ করলে কিছুটা সুফল পাওয়া যেতে পারে।

✓ পরিপূরক খাদ্যের সাথে টেরামাইসিন মিশিয়ে মাছ কে কয়েকদিন খাওয়ালে রোগের প্রতিকার করা যাবে।

আলসার বা সপূষক্ষত:

- **রোগ লক্ষন :**

▪ মাছের দেহে ছোটছোট ক্ষত দেখা যায়।

▪ পরে মাছের দেহের মাংশল অংশ এবং আঁশ বেরিয়ে আসে।

আলসার রোগাক্রান্ত মাছ
ছবির উৎস: Anit Mondal

- **প্রতিকার:**
  - ✓ প্রতি কেজি মাছের খাবারের সাথে ২৫ থেকে ৭৫ গ্রাম অক্সিটেট্রাসাইক্লিন মিশিয়ে পরপর ৫ দিন খাওয়ালে উপকার পাওয়া যায়।

ড্রপসি:

- **রোগ লক্ষন:**
  - ▪ এই রোগে আক্রান্ত মাছের শরীরে এবং আঁশের নীচে জল জমা হয়, আঁশ বাইরে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়।
  - ▪ মাছের পেতে অল্প চাপ দিলে জল বেরিয়ে আসতে দেখা যায়।

ড্রপসি রোগাক্রান্ত মাছ
ছবির উৎস: Ms. Gunjan Karnatak, ICAR-CIFRI

- **প্রতিকার:**
    - ✓ প্রতি লিটার জলে ১-৫ মিলিগ্রাম পটাসিয়াম পারমাঙ্গানেট এর দ্রবণে মাছ গুলিকে ২ মিনিট ধরে ডোবালে কিছুটা প্রতিকার পাওয়া যায়।
    - ✓ ৪.৫ লিটার জলে ৬০ মিলিগ্রাম ক্লোরোমাইসিটিন মিশিয়ে প্রয়োগ করলে উপকার পাওয়া যায়। এই চিকিৎসার সময় কোনোরূপ খাওয়ার প্রয়োগ করা উচিত নয়।

চক্ষুছানি: সাধারণত এই রোগটি কাতলা মাছের ক্ষেত্রে বেশি দেখা যায়।

- **রোগলক্ষন:**
    - ▪ প্রাথমিক দশায় মাছের চোখ অস্বচ্ছ হয়ে যায় এবং পরে চোখ নষ্ট হয়ে যায়, শেষ পর্যায়ে মাছ মারা যায়।
- **প্রতিকার:**
    - ✓ প্রতি লিটার জলে ৮ থেকে ১০ মিলিগ্রাম ক্লোরোমাইসিটিন এ ১ ঘন্টা (পরপর ২ থেকে ৩ দিন) মাছকে ডুবিয়ে রাখলে উপকার পাওয়া যায়।
    - ✓ এছাড়া পুকুরে ১ মিলিগ্রাম প্রতি লিটার জল হিসেবে প্রয়োগ করলে উপকার পাওয়া যায়।
    - ✓

আদ্যপ্রাণী বা প্রটোজোয়া ঘটিত রোগ:

হোয়াইট স্পট বা ইকথিওপথিরিয়েসিস: এটি একপ্রকার এর আদ্যপ্রাণী বা প্রটোজোয়া ঘটিত রোগ। পুকুরে অতিরিক্ত মাছ থাকলে গরমকালে এই রোগ দেখা যায়।

- **রোগলক্ষন:**
    - ▪ আক্রান্ত মাছের গায়ে, পাখনা এবং ফুলকায় সাদা গুটিগুটি দাগ দেখা যায়।
    - ▪ মাছকে পুকুরের পাশে ঘুরতে দেখা যায় এবং মাটি বা অন্য কোনো শক্ত জিনিসে গা ঘষতে দেখা যায়।

- **প্রতিকার:**
    - ✓ প্রতি ৫ লিটার জলে ১ মিলিলিটার ফরমালিন মিশিয়ে ওই দ্রবণে আক্রান্ত মাছকে ঘন্টাখানেক (পরপর ৭ দিন) ডুবিয়ে রাখলে কিছুটা উপকার পাওয়া যায়।
    - ✓ প্রতি লিটার জলে ৩০ গ্রাম লবন মিশিয়ে আক্রান্ত মাছকে ৫ মিনিট ডুবিয়ে ছেড়ে দিতে হবে।

কৃমি ঘটিত রোগ:

গাইরোডাক্টইলোসিস এবং ডাক্টইলোগাইরোসিস: এটি একপ্রকার কৃমি ঘটিত রোগ।

- **রোগলক্ষন:**
  - মাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।
  - ডাক্টইলোগাইরোসিস এর ক্ষেত্রে মাছের ফুলকা বিবর্ণ হয়ে যায় এবং মাছের লালা অর্থাৎ মিউকাস অতিরিক্ত বেরোতে দেখা যায়।
  - গাইরোডাক্টইলোসিস এর ক্ষেত্রে মাছের শরীর বিবর্ণ হতে থাকে, মাছের দেহ থেকে আঁশ খুলে পড়তে দেখা যায় এবং মাছের মিউকাস অতিরিক্ত বেরোতে দেখা যায়।
- **প্রতিকার:**
  - ✓ প্রতি লিটার জলে ৩০ থেকে ৫০ গ্রাম লবন মিশিয়ে ওই দ্রবণে আক্রান্ত মাছকে ১০ থেকে ১৫ মিনিট মাছকে ডুবিয়ে রাখলে উপকার পাওয়া যায়।
  - ✓ ১০০ লিটার জলে ২৫ মিলিলিটার ফরমালিন মিশিয়ে ওই দ্রবণে আক্রান্ত মাছকে ১০ থেকে ১৫ মিনিট মাছকে ডুবিয়ে রাখলে উপকার পাওয়া যায়।

কবচী প্রাণী ঘটিত রোগ:

আরগুলোসিস বা মাছের উকুন: সাধারণত কার্প জাতীয় মাছ অর্থাৎ রুই, কাতলা, মৃগেল এই জাতীয় মাছ গুলি আরগুলোসিস দ্বারা বেশি আক্রান্ত হয়।

আরগুলোসিস রোগাক্রান্ত মাছ
ছবির উৎস: Dr. Raju Baitha, ICAR-CIFRI

- **রোগলক্ষন:**
    - এগুলিকে সাধারণত খালি চোখে মাছের গায়ে দেখা যায়।
    - মাছের গা থেকে আঁশ গুলি আলগা হয়ে পড়ে।
    - আক্রান্ত স্থানে রক্তের চিহ্ন দেখা যায় এবং মাছ দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে।
    - আক্রান্ত মাছ গুলি পুকুরের কিনারায় গা ঘষতে থাকে।

- **প্রতিকার:**
    - ✓ রোগের প্রাথমিক অবস্থায় প্রতি লিটার জলে ৩০ গ্রাম লবন মিশিয়ে সেই দ্রবণে আক্রান্ত মাছ গুলিকে ৫-৬ মিনিট করে ২-৩ দিন ডোবাতে হবে
    - ✓ প্রতি লিটার জলে ০.৫ মিলিগ্রাম গ্যামাক্সিন পুকুরে প্রয়োগ করলে কিছুটা উপকার পাওয়া যায়

ছত্রাক ঘটিত রোগ:

ফুলকা পচা রোগ: এটি একটি ছত্রাকঘটিত রোগ।

- **রোগলক্ষন:**
    - প্রথমে মাছের ফুলকাতে লাল গুটি দেখা যায় এবং পরে মাছের ফুলকা বিবর্ণ হয়ে ঈষৎ ধূসর বর্ণে রূপান্তরিত হয়।
    - এরপর মাছের ফুলকা পচতে শুরু করে এবং আক্রান্ত মাছগুলি পুকুরের উপরিভাগে খাবি খেতে দেখা যায়।

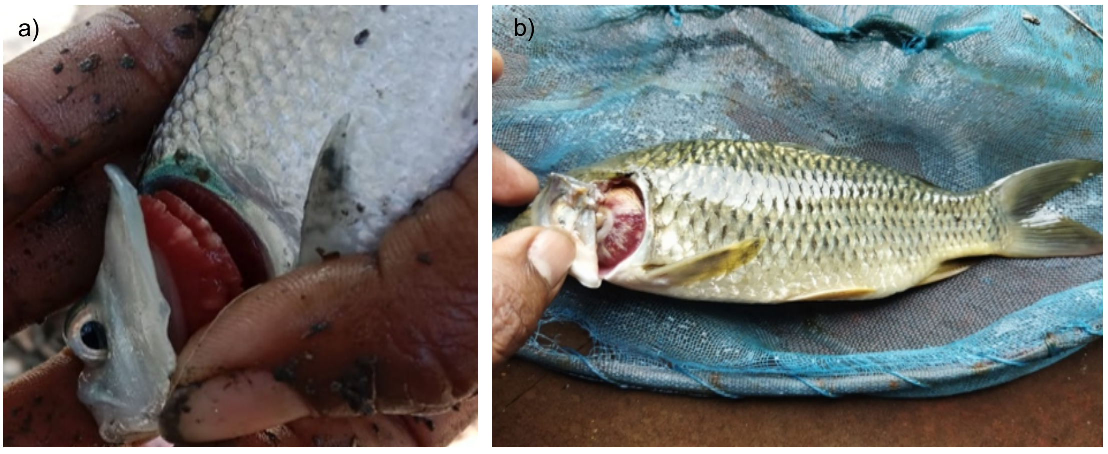

ফুলকা পচা রোগাক্রান্ত মাছ
ছবির উৎস: Anit Mondal (a) & Ms. Gunjan Karnatak, ICAR-CIFRI (b)

- **প্রতিকার:**
  - ✓ প্রতি হেক্টরে ১০০ থেকে ১৫০ কেজি চুন সমান ৩ টি ভাগেভাগ করে প্রয়োগ করলে উপকার পাওয়া যায়।
  - ✓ ১ লিটার জলে ৩০ থেকে ৪০ গ্রাম লবন মিশিয়ে ওই লবন জলে মাছগুলিকে ৫ থেকে ১০ মিনিট ডুবালে উপকার পাওয়া যায়।
  - ✓ ১০ লিটার জলে ১ গ্রাম তুঁতে মিশিয়ে ওই দ্রবণে প্রায় ৩০ মিনিট ডুবিয়ে রাখলে উপকার পাওয়া যায়।

এপিজুটিক আলসারেটিভ সিন্ড্রোম (EUS): এটি মূলত ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক ঘটিত রোগ।

- **রোগলক্ষন:**
  - আক্রান্ত মাছ গুলি অস্বাভাবিকভাবে ভাসতে দেখা যায়।
  - প্রাথমিকভাবে মাছের শরীরে লাল ক্ষত বা আলসার দেখা যায়।
  - পরবর্তীকালে এই আলসার গুলি আরো বড়ো হতে শুরু করে, শেষে কালো রঙের হয়ে যায় এবং আঁশ গুলি খুলে পড়তে দেখা যায়।
- **প্রতিকার:**
  - ✓ পুকুরে বিঘাপ্রতি ৩০ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করে জাল টেনে ভালোভাবে ঘেটে দিয়তে হবে।
  - ✓ আক্রান্ত মাছকে প্রতি লিটার জলে ৫ থেকে ১০ গ্রাম পটাসিয়াম পারমাঙ্গানেট মিশিয়ে এবং প্রতি লিটার জলে ৫০ গ্রাম লবন মিশিয়ে ওই দ্রবণে ডুবিয়ে ছাড়লে উপকার পাওয়া যায়।
  - ✓ CIFA এর বিজ্ঞানীদের দ্বারা প্রস্তুত CIFAX প্রয়োগ করেও এই রোগের হাত থেকে বাঁচা যেতে পারে।

মাছ চাষের রোগব্যাধি এড়াতে সতর্কতা বা করণীয়: কী করবেন এবং কী করবেন না যা করবেন (Do's):

- শীতের শুরুতে (নভেম্বর - ডিসেম্বর) ও শীত শেষে (ফেব্রুয়ারি - মার্চ) বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এই সময়ে জলের তাপমাত্রা দ্রুত পরিবর্তিত হওয়ায় মাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। তাই নিয়মিত জলের গুণমান পরীক্ষা, প্রয়োজন অনুযায়ী পুকুরে লবন, পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট, চুন প্রয়োগ এবং খাদ্যের পরিমাণ সামান্য কম করতে হবে।
- মাছ চাষের পুকুরের পরিবেশ এবং জলের গুণমান বজায় রাখতে হবে।
- ভালোমানের চারাপোনা মজুত করতে হবে।
- মাছ চাষের পুকুরে নিয়মিত মাছের পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং কোনোপ্রকার রোগ ধরতে পারলে তার জন্যে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।
- কোথাও মাছকে দূরে পাঠাতে হলে পরিবহনের আগে মাছের খাবার বন্ধ রাখতে হবে।
- হ্যান্ডলিংয়ের পর রোগ প্রতিরোধ করতে প্রতি লিটার জলে ১০ থেকে ৩০ গ্রাম লবন জলে মাছ গুলিকে ডুবাতে হবে, এবং মাছের রোগের আশঙ্কা কমাতে প্রতি লিটার জলে ২ থেকে ৪ মিলিগ্রাম পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ($KMnO_4$) জলে ডুবিয়ে পুকুরে ছাড়তে হবে যা বাহ্যিক ক্ষতের জন্যেও কার্যকর।
- চারাপোনা পুকুরে ছাড়ার আগে পোনার পলিথিনের ব্যাগগুলিকে ওই পুকুরের জলে কিছুক্ষন ভাসিয়ে রাখতে হবে কারণ ওই পলিথিনের ব্যাগের তাপমাত্রা ও পুকুরের জলের তাপমাত্রার সমতা আনা আবশ্যক।
- মরা মাছগুলিকে পুকুর থেকে তুলে মাটিতে গর্ত করে পুঁতে দিতে হবে।
- ওষুধের মাত্রা রোগের অবস্থা ও পরিবেশ পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে, তাই কোনো ওষুধ প্রয়োগের আগে মৎস্য বিশেষজ্ঞ এর পরামর্শ নিতে হবে।
- নির্দিষ্ট সময় পরপর মাছের বৃদ্ধি, বাহ্যিক ক্ষত, ফুলকার রং, পরজীবী উপস্থিতি এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্যের পরীক্ষা করতে হবে।
- ওষুধ বা রাসায়নিক প্রয়োগের আগে অবশ্যই মৎস্য বিশেষজ্ঞ বা মৎস্য দপ্তরের পরামর্শ নিতে হবে।

পটাসিয়াম পারমাঙ্গানেট দ্বারা মাছের বিশুদ্ধিকরণ
ছবির উৎস: Ms. Gunjan Karnatak, ICAR-CIFRI

যা করবেন না (Don’ts):

- বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক, রাসায়নিক বা অন্য কোনো ওষুধ ব্যবহার করা যাবে না।
- অসুস্থ, দুর্বল বা অজানা জায়গার চারাপোনা পুকুরে ছাড়া যাবে না।
- অতিরিক্ত ঘনত্বে মাছ পুকুরে ছাড়া যাবে না।
- অতিরিক্ত খাদ্য বা সার প্রয়োগ করা যাবে না, কারণ এতে জলের গুণমান দ্রুত নষ্ট হয়।
- পুকুরে মৃত মাছ বা পচনশীল জৈব বর্জ্য ফেলে রাখা যাবে না।
- শীতের তীব্র সময় (ডিসেম্বর – জানুয়ারি) অথবা খুব কম তাপমাত্রায় নতুন পোনা মজুদ করা যাবে না।
- একই জাল, বালতি বা অন্যান্য সরঞ্জাম জীবাণুমুক্ত না করে একাধিক পুকুরে ব্যবহার করা যাবে না।
- বৃষ্টি, বন্যা বা জোয়ারের পর জলের গুণমান পরীক্ষা না করে নতুন পোনা বা ওষুধ দেওয়া যাবে না, বিশেষ করে সুন্দরবন অঞ্চলে, যেখানে লবণাক্ততার পরিবর্তন দ্রুত ঘটে।

মনে রাখবেন: নিয়মিত পর্যবেক্ষণ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পুকুর, সুস্থ পোনা, উন্নত জৈব-নিরাপত্তা এবং সময়মতো সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণই মাছের রোগ প্রতিরোধের সবচেয়ে কার্যকর উপায়।

মাছ আহরণ ও আহরণের সময়সূচি:

মাছ চাষের সর্বশেষ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো মাছ আহরণ। সঠিক সময়ে মাছ আহরণ করলে যেমন ভালো বাজারদর পাওয়া যায়, তেমনি পুকুরের উৎপাদনশীলতাও বজায় থাকে। মাছের বৃদ্ধি, বাজারের চাহিদা, আবহাওয়া, পুকুরের অবস্থা এবং স্থানীয় পরিবেশ বিবেচনা করে পুকুর থেকে মাছ ধরতে হবে।

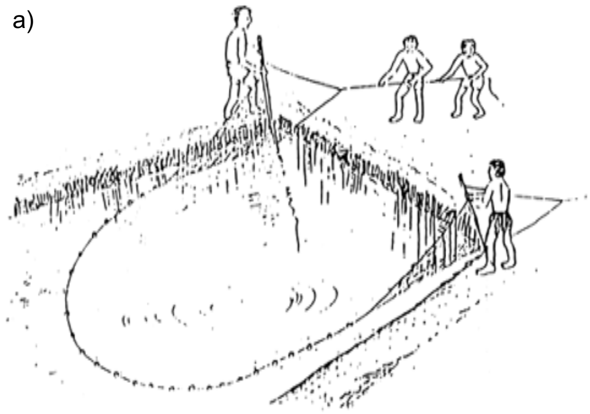

মাছ আহরণ

ছবির উৎস: FAO (a) & Ms. Gunjan Karnatak, ICAR-CIFRI (b)

১) সম্পূর্ণ মাছ আহরণ (Complete Harvesting):

- সাধারণত কার্প জাতীয় বড়ো প্রজাতির মাছ যেমন কাতলা, রুই ও মৃগেল ১০ – ১২ মাসে বাজারজাত করার উপযুক্ত আকারে পৌঁছায়। তাই সম্ভব হলে এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগে সম্পূর্ণ আহরণ না করাই ভালো।
- তবে রোগের প্রাদুর্ভাব, বন্যা, জলসংকট অথবা জরুরি আর্থিক প্রয়োজন হলে নির্ধারিত সময়ের আগেও মাছ তুলে বিক্রি করা যেতে পারে।
- যেসব পুকুরে সারা বছর পর্যাপ্ত জল থাকে না, সেখানে জল কমে যাওয়ার আগেই মাছ তুলে নেওয়া উচিত।
- সুন্দরবনের যেসব এলাকায় সাধারণত বর্ষাকালে (জুন – সেপ্টেম্বর) বন্যা, জোয়ার ও বাঁধ ভাঙার ঝুঁকি থাকে সেখানে আগেই বড় মাছ তুলে নেওয়া নিরাপদ।
- নতুন পোনা সাধারণত বর্ষা শেষে (সেপ্টেম্বর – অক্টোবর) মজুত করলে মাছের বেঁচে থাকার হার বেশি হয় এবং লবণাক্ততার ওঠানামার ঝুঁকি কমে যায়।
- ঘূর্ণিঝড় বা অতিবৃষ্টির তে বাঁধ ভেঙে পুকুর ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে বাজারযোগ্য মাছ দ্রুত আহরণ করা লাভজনক।

২. আংশিক বা ধাপে ধাপে মাছ আহরণ (Partial Harvesting):

- সব মাছ একই গতিতে বৃদ্ধি পায় না। তাই বড় মাছ আগে তুলে ছোট মাছকে আরও কিছুদিন বড় হওয়ার সুযোগ দিলে উৎপাদন ও লাভ দুটোই বৃদ্ধি পায়।
- আংশিক আহরণের উপকারিতা:
- বাজারজাত উপযোগী মাছ সময়মতো বিক্রি করা যায়।
- পুকুরে মাছের ঘনত্ব কমে যাওয়ায় অক্সিজেনের চাহিদা কমে এবং জলের গুণমান ভালো থাকে।
- ছোট মাছ বেশি খাদ্য ও জায়গা পেয়ে দ্রুত বৃদ্ধি পায়।
- সারা বছর নিয়মিত আয় নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

কখন আংশিক আহরণ করবেন?

- সাধারণত ৫০০ গ্রাম থেকে ১ কেজি ওজনের মাছ বাজারজাত করা সবচেয়ে লাভজনক।
- প্রতি ২ – ৩ মাস অন্তর বড় মাছ নির্বাচন করে বাজারজাত করা যেতে পারে।
- প্রতিবার আংশিক আহরণের পরে প্রয়োজন অনুযায়ী ১৫০ – ২০০ গ্রাম ওজনের চারাপোনা পুনরায় পুকুরে ছেড়ে দিলে পুকুরে উৎপাদনের ধারাবাহিকভাবে বজায় থাকে।

আহরণের সময় যা খেয়াল রাখা উচিত

- সব মাছ একসঙ্গে তুলে ফেলা যাবে না, যদি না সম্পূর্ণ চাষের সময় শেষ হয়ে যায়।
- ছোট মাছকে আরও কিছুদিন বড় হওয়ার সুযোগ দিতে হবে।
- পুকুর অতিরিক্ত গোলানো যাবে না, এতে জলের গুণমান খারাপ হতে পারে।
- অসুস্থ মাছ সুস্থ মাছের সঙ্গে পরিবহন করা যাবে না।
- আংশিক আহরণের পরে পুকুরের জল, খাদ্য ও সার ব্যবস্থাপনা পুনরায় ব্যবস্থা করতে হবে।

CGIAR is a global research partnership for a food-secure future. CGIAR science is dedicated to transforming food, land, and water systems in a climate crisis. Its research is carried out by 13 CGIAR Centers/Alliances in close collaboration with hundreds of partners, including national and regional research institutes, civil society organizations, academia, development organizations and the private sector. www.cgiar.org

To learn more about this program, please visit: https://www.cgiar.org/cgiar-research-porfolio-2025-2030/sustainable-animal-and-aquatic-foods/

CGIAR SUSTAINABLE ANIMAL AND AQUATIC FOODS

IWMI International Water Management Institute

भाकृअनुप ICAR

LRRM